প্রত্যাশা

কলেজ বার্ষিকী ২০২৫-২০২৬

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ

আমাদের মিশন

সমাজের সকল মানুষের জন্য মানসম্মত ও সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা।

রোগীবান্ধব এবং আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা।

চিকিৎসা ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ও স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা।

শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সক্ষম করে তুলতে গবেষণাভিত্তিক শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা, যাতে তারা দেশ ও বিশ্বের স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রাখতে পারে।

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ

প্রত্যাশা

কলেজ বার্ষিকী ২০২৫-২০২৬

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ

৩২৩/৪৩৪, শমসের পাড়া, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

কুরআন
একটি বরকতময় গ্রন্থ, যা অবতীর্ণ করা হয়েছে
যাতে মানুষ এর আয়াত নিয়ে গবেষণা করে
এবং
জ্ঞানী ব্যক্তিরা এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।
(সুরা সাদ: আয়াত-২৯)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত,
তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,
"যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য
কোনো পথ অবলম্বন করে,
আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।"
- মুসলিম

সূচি

প্রকাশনা পর্ষদ	০৪
বাণী	০৫-০৯
সম্পাদকীয়	১০
সহ সম্পাদকীয়	১১
জুলাই শহীদদের স্মরণে	১২
এক্সিকিউটিভ কমিটি	১৩-১৪
গভর্নিং বডি	১৫-১৭
শিক্ষকবৃন্দের তালিকা	১৮-৩০
গল্প ও কবিতা	৩১-৯২
কৃতি শিক্ষার্থী	৯৩-৯৯
প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সফলতা	১০০-১০৭
ভর্তিকৃত ব্যাচসমূহ	১০৮
স্মৃতির অ্যালবাম	১০৯-১২৪

প্রকাশনা পর্ষদ

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ

প্রত্যাশা
কলেজ বার্ষিকী ২০২৫-২০২৬

প্রধান পৃষ্ঠপোষক:

ডা. একেএম ফজলুল হক
চেয়ারম্যান, কার্যকরী পরিষদ, ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ।

পৃষ্ঠপোষক:

অধ্যাপক মোহাম্মদ নুরুন্নবী
সেক্রেটারি (ভারপ্রাপ্ত), কার্যকরী পরিষদ, ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ।

মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আকবর
ট্রেজারার, কার্যকরী পরিষদ, ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ।

অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন
অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ।

অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ টিপু সুলতান
একাডেমিক এ্যাডভাইজার, চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ।

অধ্যাপক ডা. মুসলিনা আখতার
উপাধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ।

সম্পাদক

ডা. মোহাম্মদ নাজমুল হুদা রিপন, সহযোগী অধ্যাপক, শিশুরোগ বিভাগ।

সহ-সম্পাদক

ডা. শেখ মোঃ ইরফান, সহকারী অধ্যাপক, ফরেনসিক মেডিসিন ও ইনচার্জ, ইসিএ ডিভিশন।

সম্পাদনা সহযোগী

অধ্যাপক ডা. মোঃ পারভেজ ইকবাল শরীফ, বিভাগীয় প্রধান, কমিউনিটি মেডিসিন এন্ড পাবলিক হেল্‌থ।

ডা. মোঃ শেরান, সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, মাইক্রোবায়োলজি।

ডা. ফারজানা চৌধুরী, সহযোগী অধ্যাপক, অব্‌স এন্ড গাইনি বিভাগ।

ডা. এস.এম কাউসার, সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক্স বিভাগ।

সহযোগিতায়

ডা. মোঃ ওমর গনি, সিনিয়র সহকারী পরিচালক, একাডেমিক অ্যাফেয়ার্স ডিভিশন।

মোঃ এহসানুর রহমান ছিদ্দিকী, সহকারী পরিচালক, একাডেমিক অ্যাফেয়ার্স ডিভিশন।

আলমগীর মোহাম্মদ ফাহিম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও পি.এ টু প্রিন্সিপ্যাল, সিআইএমসি।

সার্বিক তত্ত্বাবধান

মুহাম্মদ রকিবুল হাকীম, সিনিয়র প্রশাসনিক কর্মকর্তা, এক্সট্রা কারিকুলার এক্টিভিটিজ ডিভিশন।

প্রচ্ছদ, অলংকরণ ও মুদ্রণে:
সিটি কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন: ০২ ৩৩৩৩ ৮৯৪০০, মোবাইল: ০১৭১৬-৭৬৭৯৫৪
E-mail : citycomctg@yahoo.com, rislamcity@gmail.com

উপাচার্য
চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

বাণী

"Quality with Morality"

এই স্লোগানে সুশিক্ষা বিস্তারে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ। গুণগত শিক্ষা ও নৈতিকতার অপূর্ব সমন্বয়ের পাশাপাশি ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধূলা এবং শরীর চর্চার ধারা অব্যাহত রাখতে চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ এর বহুমাত্রিক কর্মকান্ডের আয়োজন অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার। তারই ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ এর বার্ষিক প্রকাশনা কলেজ ম্যাগাজিন 'প্রত্যাশা' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রতিটি মানুষের মাঝেই সৃজনশীলতা অন্তর্নিহিত থাকে। এ ধরনের বার্ষিক প্রকাশনার মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীরা খুঁজে পায় তাদের প্রতিভা বিকাশের পথ।

আমি আশা করি তাদের এই সুন্দর চর্চা অব্যাহত থাকবে এবং ভালো চিকিৎসক হওয়ার পাশাপাশি সৃজনশীল ও আলোকিত মানুষ হবে। আমি কলেজ কর্তৃপক্ষ ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে এই সুন্দর ও প্রশংসনীয় উদ্যোগের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

Omar Faruque Yusuf

(অধ্যাপক ডা. ওমর ফারুক ইউসুফ)
উপাচার্য
চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

চেয়ারম্যান
এক্সিকিউটিভ কমিটি

বাণী

জ্ঞান বিজ্ঞান আর তথ্য প্রযুক্তির চরম শিখরে যখন গোটা পৃথিবী, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে দেশ যখন চলমান তখন চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ থেকে আমাদের শিক্ষার্থীরাও উন্নয়নে করছে অংশগ্রহণ। সত্যিকারের দেশ প্রেমিক হয়ে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটিয়ে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে এ কলেজের শিক্ষার্থীরাও পড়ালেখার পাশাপাশি চালিয়ে যাচ্ছে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, শিক্ষা সফর ও কলেজ বার্ষিকীর মতো সহপাঠক্রমিক নানান কর্মকান্ড।

অন্তরের সুকুমার বৃত্তি পরিস্ফুটনের লক্ষ্যে সাহিত্য-শিল্প জগতে হাঁটি হাঁটি পা পা করে কলম তুলি ধরে কলেজ বার্ষিকীর পূর্ণতা দিতে লিখেছে এরা। আমার বিশ্বাস এদের হাত দিয়েই একদিন তৈরি হবে মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন বৈষম্যহীন সর্বাধুনিক নৈতিক সমাজ, তাদের চিকিৎসা সেবায় আরোগ্য লাভ করবে মানুষ।

আমার বিশ্বাস এরা শুধু মানুষ হবে না, হবে দক্ষ মানবসম্পদ। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার দীপ্ত প্রত্যয় নিয়ে এগোচ্ছে এ প্রজন্ম, গতি দুর্বার, জয় তাদের অনিবার্য। বাংলাদেশকে অগ্রগতির চূড়ান্ত সীমায় নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কলেজের বার্ষিকী **'প্রত্যাশা'** খুবই সামান্য সংযোজন। আশা করি এই ম্যাগাজিনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।

(ডা. একেএম ফজলুল হক)
চেয়ারম্যান (এক্সিকিউটিভ কমিটি)
ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ্ (ডিইএসএইচ) ও
চেয়ারম্যান, গভর্নিং বডি
চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ

সেক্রেটারি
এক্সিকিউটিভ কমিটি

বাণী

ম্যাগাজিন বলতেই আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী, কৌতুক আর কিছু ছবি যা আমাদের জীবনকে দুঃখ-কষ্ট আর হতাশা থেকে মুক্তি দেয়। প্রতিটি লেখা ও ছবির মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাতন্ত্র্য ও মননশীলতার প্রকাশ ঘটে এবং জাতিকে সামগ্রিক উন্নতির শীর্ষে নিয়ে যায়। তারই সারথী হতে চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ প্রকাশ করতে যাচ্ছে বার্ষিক সাময়িকী **'প্রত্যাশা'**। এই বার্ষিকী প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ক্ষুদে শিল্পীদের কাঁচা লেখার মধ্য দিয়ে ওদের সুপ্ত প্রতিভার উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটুক এ আমার প্রত্যাশা।

গতানুগতিক পাঠদানের পাশাপাশি জীবনমুখী শিক্ষা ও ক্লাব কার্যক্রমকে এই প্রতিষ্ঠান উৎসাহিত করে থাকে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, উন্নয়নের রূপকল্প, সাংস্কৃতিক বিকাশ, প্রগতিশীল চিন্তা, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও নিরবিচ্ছিন্ন শান্তির মূল্যবোধকে ধারণ করে শুরু থেকেই এই প্রতিষ্ঠান তার অব্যাহত অগ্রযাত্রা চলমান রেখেছে। এ সব কার্যক্রমের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠান এই অঞ্চলের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

আমাদের এই স্বাপ্নিক যাত্রায় আমি সকল শিক্ষক, অভিভাবক, পরিচালনা পর্ষদসহ সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।

(অধ্যাপক মোহাম্মদ নুরুন্নবী)
সেক্রেটারি (ভারপ্রাপ্ত), এক্সিকিউটিভ কমিটি
ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ

অধ্যক্ষ

সিআইএমসি

বাণী

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎস্য অনুষদের অন্তর্ভুক্ত একটি বেসরকারী চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩-২০১৪ সালে প্রথম ব্যাচে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির মধ্য দিয়ে এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সরকারী নিয়ম অনুসারে অত্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি এবং অভিযত্ন সহকারে শিক্ষা প্রদান করা হয়। ফলশ্রুতিতে পেশাগত পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী মেধা-তালিকায় স্থান সহ অত্যন্ত ভাল ফলাফল করে আসছে। কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষা ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক বিকাশের জন্য কারিকুলাম বহির্ভূত এক্সট্রা কারিকুলার এক্টিভিটিস (ইসিএ) এর বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন-খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক সপ্তাহ, বনভোজন, শিক্ষা সফর এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস সমূহ নিয়মিতভাবে উদযাপন করা হয়।

শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ও নৈতিকতা সম্পন্ন শিক্ষা দান অত্র প্রতিষ্ঠানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যা আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের একজন চিকিৎসক ছাড়াও একজন নীতিবান মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে। চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মেডিসিন, সার্জারী, অবস্ এন্ড গাইনী, পেডিয়েট্রিক্স, ইএনটি, এ্যানেস্থেসিওলজি ও ডার্মাটোলজী বিভাগের প্রশিক্ষণ বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স এন্ড সার্জন্স (বিসিপিএস) কর্তৃক এফসিপিএস দ্বিতীয় পর্ব পরীক্ষার জন্য অনুমোদিত। গবেষণা কার্যক্রমেও অত্র প্রতিষ্ঠান অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। যার ফলে সর্বমহলে কলেজের সুনাম আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া ও প্রতিষ্ঠানটি ২০১৬ ইং থেকে নিয়মিত মেডিকেল জার্নাল প্রকাশ করে আসছে।

যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে অত্র প্রতিষ্ঠানকে একটি আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎস শিক্ষা ও সেবা প্রতিষ্ঠানে রূপদান করা আমাদের স্বপ্ন ও অঙ্গীকার। এখানে রয়েছে আস্থা, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, বিশ্বাসের বন্ধন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।

আমাদের বার্ষিক ম্যাগাজিন-২০২৫ 'প্রত্যাশা' প্রকাশের এই মহৎ উদ্যোগকে স্বাগত এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। ম্যাগাজিন প্রকাশনা সাফল্যমন্ডিত হোক এবং কলেজের সার্বিক কার্যক্রম গতিশীল থাকুক, এই কামনা করছি।

(অধ্যাপক ডা. মোঃ মুসলিম উদ্দীন)
অধ্যক্ষ
চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ

উপাধ্যক্ষ

সিআইএমসি

বাণী

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ সরকার অনুমোদিত একটি বেসরকারী মেডিকেল কলেজ। ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অত্র প্রতিষ্ঠান মানসম্পন্ন চিকিৎসা শিক্ষা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

নিয়মিত পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষার্থীদের মেন্টরিং, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা ভ্রমন, সামাজিক কর্মকান্ড, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালনসহ বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

এছাড়াও শিক্ষকদের জন্য রিসার্চ কার্যক্রম, নিয়মিত বৈজ্ঞানিক জার্নাল প্রকাশ, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সেমিনার আয়োজন করে আসছে।

এরই ধারাবাহিকতায় ECA (Extra Curricular Activity) এর মাধ্যমে কলেজ বার্ষিকী প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আশা করি এই বার্ষিকী অন্যান্য সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের ন্যায় মান ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে। এর মাধ্যমে সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ লেখনীর দ্বারা তাদের নিজস্ব মেধা বিকাশের সুযোগ পাবেন এবং বার্ষিকী প্রকাশের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সাহায্য করবেন।

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ এর কলেজ বার্ষিকী একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।

আমি বার্ষিকী প্রকাশের ধারাবাহিকতা সহ উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করি।

(অধ্যাপক ডা. মুসলিনা আখতার)
উপাধ্যক্ষ
চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ

সম্পাদকের
কলম থেকে...

আসসালামু আলাইকুম।

ধারাবাহিক কলেজ ম্যাগাজিন 'প্রত্যাশা'র ২য় সংখ্যায় অনেক আগেই বের হওয়ার কথা ছিলো। জুলাই বিপ্লবের এত বড় আত্মত্যাগ আর বিজয়কে উপলক্ষ্য করে বের হওয়ার কথা ছিলো বিশেষত জুলাই ক্রোড়পত্র। চারদিকে এত অস্থিরতা আর হতাশার মাসেও এই সময়ে কলেজ ম্যাগাজিনটি বের হওয়াটা অনেক তৃপ্তির স্বাদ এনে দিয়েছে।

ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

এই সংখ্যায় মূলতঃ জুলাই বিপ্লবকে অনুসঙ্গ করেই অধিকাংশ লেখা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সবগুলো লেখাই মানসম্মত। সম্পাদকের কালির আঁচড়ে কিছু লেখা হয়তো বা ঝড়ে গেছে। সেজন্যও দুঃখ প্রকাশ করছি। ভবিষ্যতে আরো চমৎকার লেখা প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ।

'প্রত্যাশা'র সকল লেখকদের ধন্যবাদ জানাই। যারা 'প্রত্যাশা'র প্রকাশনার সময়, শ্রম ও মেধা দিয়ে সাহায্য করেছেন তাদের সহ 'ইকাড' (ECAD) এর সকল কুশীলবের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

(ডা. মোহাম্মদ নাজমুল হুদা রিপন)
সহযোগী অধ্যাপক
শিশুরোগ বিভাগ।

সহ-সম্পাদকীয়

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের কলেজ ম্যাগাজিন 'প্রত্যাশা' ২০২৬ প্রকাশের এই আনন্দঘন মুহূর্তে সহ-সম্পাদক হিসেবে আমার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা সত্যিই কঠিন। প্রত্যাশা কেবল একটি ম্যাগাজিন নয়; এটি আমাদের স্বপ্ন, চিন্তা, সৃজনশীলতা ও আত্মপ্রকাশের এক উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি।

একজন চিকিৎসক ও চিকিৎসা শিক্ষার্থীর জীবন যেমন কঠোর অধ্যবসায় ও দায়িত্ববোধে পরিপূর্ণ, তেমনি এর মাঝে লুকিয়ে থাকে অসংখ্য অনুভূতি, গল্প ও সৃষ্টিশীলতার বীজ। সেই অপ্রকাশিত ভাবনাগুলোকেই তুলে ধরার এক অনন্য মাধ্যম এই ম্যাগাজিন। সাহিত্য, গবেষণা, শিল্প ও মননের বহুমাত্রিক প্রকাশ এখানে একসূত্রে গাঁথা হয়েছে।

এই ম্যাগাজিন প্রকাশের পেছনে যাঁদের নিরলস পরিশ্রম ও সহযোগিতা রয়েছে—সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, সম্পাদকমণ্ডলী এবং সকল লেখক ও অবদানকারীদের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই প্রত্যাশা'কে করেছে আরও সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত।

আমাদের প্রত্যাশা, এই ম্যাগাজিন পাঠকদের হৃদয়ে স্থান করে নেবে এবং ভবিষ্যতের পথচলায় নতুন প্রেরণা জোগাবে। সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণেই প্রত্যাশা হয়ে উঠুক আমাদের সবার গর্বের প্রতীক।

সবার জন্য রইল শুভকামনা।

(ডা. শেখ মোঃ ইরফান)
সহকারী অধ্যাপক
ফরেনসিক ইনচার্জ, ইসিএ ডিভিশন।

জুলাই শহীদদের স্মরণে...

এক্সিকিউটিভ কমিটি
ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন এন্ড হেলথ

ডা. একেএম ফজলুল হক
সভাপতি

অধ্যক্ষ মোহাম্মদ তাহের
সহ-সভাপতি

অধ্যাপক ড. কাজী দ্বীন মোহাম্মদ
সহ-সভাপতি

অধ্যাপক মোহাম্মদ নুরুন্নবী
সেক্রেটারি (ভারপ্রাপ্ত)

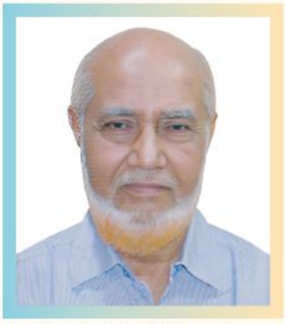

মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আকবর
ট্রেজারার

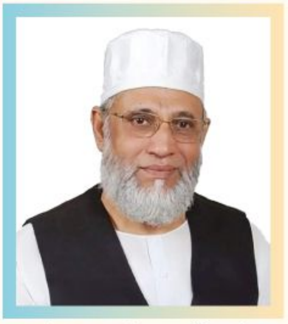

আ.ন.ম. শামসুল ইসলাম
সদস্য

মুহাম্মদ শাহজাহান
সদস্য

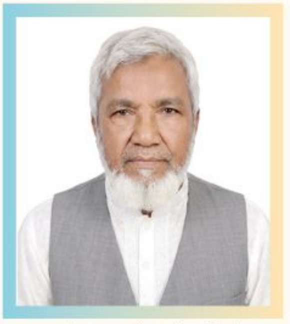

অধ্যাপক আহসান উল্লাহ
সদস্য

অধ্যক্ষ নুরুল আমিন
সদস্য

ফয়সাল মুহাম্মদ ইউনুছ
সদস্য

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ মুসলিম উদ্দিন
সদস্য

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ জালাল উদ্দিন
সদস্য

এক্সিকিউটিভ কমিটি
ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন এন্ড হেলথ

এডভোকেট মনজুর আহমদ আনসারী
সদস্য

ডা. এটিএম রেজাউল করিম
সদস্য

ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মুমিনুল হক
সদস্য

ডাঃ মুহাম্মদ ইউসুফ
সদস্য

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ টিপু সুলতান
সদস্য

অধ্যাপক ডা. খায়রুল আনোয়ার
সদস্য

মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান
সদস্য

এডভোকেট সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
সদস্য

ব্যারিস্টার মোহাঃ বেলায়েত হোসাইন
সদস্য

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ রেদওয়ানুল রহমান
সদস্য

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ

দ্বি-বার্ষিক গভর্নিং বডি (২০২৫ ও ২০২৬)

(চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি মোতাবেক গঠিত)

সম্মানিত সদস্যগণের পরিচিতি

চেয়ারম্যান
ডা. একেএম ফজলুল হক
চেয়ারম্যান
কার্যকরী পরিষদ, ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ।

ভাইস চেয়ারম্যান
অধ্যাপক ডা. অজয় দেব
ডিন
বেসিক সাইন্স ও প্যারা ক্লিনিক্যাল অনুষদ,
চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়।

সদস্য সচিব
অধ্যাপক ডা. মো. মুসলিম উদ্দিন
অধ্যক্ষ
চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের প্রতিনিধি
মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব
এ.বি.এম ইফতেখারুল ইসলাম খন্দকার
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ,
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের (DGME) প্রতিনিধি
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন)
অধ্যাপক ডা. ফারুক আহমেদ
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিনিধি,
মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

বিএমএন্ডডিসি এর প্রতিনিধি
ডা. খুরশীদ জামিল চৌধুরী
সদস্য
বিএমএন্ডডিসি।

মাননীয় উপাচার্য,
চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত
অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আব্দুর রব
উপাধ্যক্ষ
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ।

মাননীয় উপাচার্য,
চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত
অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান
অধ্যাপক
নিউরোলজি বিভাগ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ।

শিক্ষক প্রতিনিধি
অধ্যাপক ডা. মুসলিন আখতার
উপাধ্যক্ষ
চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ

দ্বি-বার্ষিক গভর্নিং বডি (২০২৫ ও ২০২৬)

(চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি মোতাবেক গঠিত)

সম্মানিত সদস্যগণের পরিচিতি

শিক্ষক প্রতিনিধি
ডা. মো. ফেরদৌস
সহযোগী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ
চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ।

অভিভাবক প্রতিনিধি
অধ্যাপক ডা. আব্দুস সালাম
শিক্ষার্থীর নাম: জেরিন তাসনিম রামিসা,
রোল নং: ০৬, ৮ম ব্যাচ,
২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষ।

অভিভাবক প্রতিনিধি
ডা. মো. ইব্রাহীম চৌধুরী
শিক্ষার্থীর নাম: তাহমিদ বিন ইব্রাহীম,
রোল নং: ২৫, ৯ম ব্যাচ,
২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষ।

উদ্যোক্তা প্রতিনিধি
মোহাম্মদ শাহজাহান
সদস্য
কার্যকরী পরিষদ, ডেভেলপমেন্ট ফর
এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ।

উদ্যোক্তা প্রতিনিধি
অধ্যাপক ড. কাজী দ্বীন মোহাম্মদ
ভাইস চেয়ারম্যান
কার্যকরী পরিষদ, ডেভেলপমেন্ট ফর
এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ।

উদ্যোক্তা প্রতিনিধি
অধ্যাপক মোহাম্মদ নুরুন্নবী
সেক্রেটারি (ভারপ্রাপ্ত)
কার্যকরী পরিষদ, ডেভেলপমেন্ট ফর
এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ।

উদ্যোক্তা প্রতিনিধি
অধ্যাপক ডা. মো. টিপু সুলতান
সদস্য
কার্যকরী পরিষদ, ডেভেলপমেন্ট ফর
এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ।

উদ্যোক্তা প্রতিনিধি
অধ্যাপক ডাঃ মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন
সদস্য
কার্যকরী পরিষদ, ডেভেলপমেন্ট ফর
এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ।

উদ্যোক্তা প্রতিনিধি
অধ্যাপক মো. সিরাজ উদদৌলা
সদস্য
কার্যকরী পরিষদ, ডেভেলপমেন্ট ফর
এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ।

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ

দ্বি-বার্ষিক গভর্নিং বডি (২০২৫ ও ২০২৬)

(চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি মোতাবেক গঠিত)

সম্মানিত সদস্যগণের পরিচিতি

উদ্যোক্তা প্রতিনিধি
ডা. মো. জসিম উদ্দিন
সদস্য
কার্যকরী পরিষদ, ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ।

উদ্যোক্তা প্রতিনিধি
এড. মনজুর আহমদ আনসারী
সদস্য
কার্যকরী পরিষদ, ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ।

উদ্যোক্তা প্রতিনিধি
অধ্যক্ষ মো. নুরুল আমিন
সদস্য
কার্যকরী পরিষদ, ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ।

উদ্যোক্তা প্রতিনিধি
ব্যারিস্টার বেলায়েত হোসেন
সদস্য
কার্যকরী পরিষদ, ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ।

উদ্যোক্তা প্রতিনিধি
ডা. মোহাম্মদ ইউসুফ
সদস্য
কার্যকরী পরিষদ, ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ।

শিক্ষকবৃন্দের তালিকা

অধ্যাপক ডা. মোঃ মুসলিম উদ্দিন
অধ্যক্ষ
চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ

অধ্যাপক ডা. মুসলিনা আখতার
উপাধ্যক্ষ
চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ

এনাটমি

অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হাবিব খান
বিভাগীয় প্রধান

অধ্যাপক ডা. তৌহিদা নাহিন
অধ্যাপক

ডা. সোনিয়া সুলতানা
সহকারী অধ্যাপক

ডা. আসাদুল্লাহ আল গালিব
প্রভাষক

ডা. নাদিয়া সুলতানা পপি
প্রভাষক

ডা. সায়েম সিরাত
প্রভাষক

ডা. নাবিলাহ সাবরিন
প্রভাষক

ডা. মোঃ জমির উদ্দিন
প্রভাষক

ডা. মোঃ আবু জোবায়ের সিদ্দিকী
প্রভাষক

ডা. মুকতার আহমদ খান
প্রভাষক

ডা. ইমরুল হাসান
প্রভাষক

ফিজিওলজি

অধ্যাপক ডা. আসমা কবির সোমা
বিভাগীয় প্রধান

ডা. জাওয়াইরিয়া রেজওয়ানা
সহকারী অধ্যাপক

ডা. মোহাম্মদ আবু নোমান ইমন
সহকারী অধ্যাপক

ডা. মো. সাইফ উদ্দিন
প্রভাষক

ডা. রাশেদ বিন আমিন
প্রভাষক

ডা. ইসপাতুন নবী
প্রভাষক

ডা. মানাল তালুকদার
প্রভাষক

বায়োকেমিস্ট্রি

অধ্যাপক ডা. শেখ মোঃ সালাউদ্দিন শরিফ
বিভাগীয় প্রধান

ডা. মোঃ হাসান মুরাদ চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক

ডা. মোসাম্মত ফারহানা তাসনিম
প্রভাষক

ডা. মোহাম্মদ সিবগাতুল আলম আনাস
প্রভাষক

ডা. আবদুল্লাহ আল মারুফ
প্রভাষক

ডা. মোহাম্মদ ইশরাক
প্রভাষক

ফরেনসিক মেডিসিন

ডা. শেখ মোহাম্মদ ইরফান
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান

অধ্যাপক ডা. মোঃ রিদওয়ানুর রহমান
অধ্যাপক

ডা. মোঃ ফয়সাল
সহকারী অধ্যাপক

ডা. রায়হান সরকার
প্রভাষক

ডা. সাইফুদ্দিন আহমেদ
প্রভাষক

ফার্মাকোলজি

ডা. মোঃ ফাতিহা তাসনীম জিনিয়া
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান

অধ্যাপক ডা. এ. জেড. এম আশেক-ই-এলাহি
অধ্যাপক

ডা. আলী আসাদুল্লাহ হোসাইনি
প্রভাষক

ডা. আনোয়ার হাসান শাকিব
প্রভাষক

ডা. এস. এম. রেজাউল করিম
প্রভাষক

কমিউনিটি মেডিসিন

অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ পারভেজ ইকবাল শরিফ
বিভাগীয় প্রধান

ডা. ফাহমিদা শাম্মি
সহকারী অধ্যাপক

ডা. মুমতাহিনা আকরাম
প্রভাষক

ডা. মোঃ খুরশেদ আলী
প্রভাষক

মাইক্রোবায়োলজি

ডা. মোহাম্মদ শেরান
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান

অধ্যাপক ডা. মোঃ টিপু সুলতান
অধ্যাপক

ডা. তাসকিন জাহান
সহকারী অধ্যাপক

ডা. মুহাম্মদ
প্রভাষক

ডা. মোঃ কামরুজ্জামান ওয়াহেদ
প্রভাষক

ডা. মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ
প্রভাষক

প্যাথলজি

অধ্যাপক ডা. নাসরিন সুলতানা
বিভাগীয় প্রধান

ডা. তাহমিনা হোসাইন
সহকারী অধ্যাপক

ডা. শরীফা আনজুম
প্রভাষক

ডা. মোহাম্মদ সাদ
প্রভাষক

ডা. মোঃ নুর হোসাইন শাওন
প্রভাষক

মেডিসিন

অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম
বিভাগীয় প্রধান

ডা. মোঃ ফেরদৌস
সহযোগী অধ্যাপক

ডা. উম্মে তাহেরা
সহযোগী অধ্যাপক

ডা. আরফানা ইয়াসমিন
সহকারী অধ্যাপক

ডা. আবু মুসা আল আমিন
সহকারী অধ্যাপক

ডা. মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন
রেজিস্ট্রার

ডা. এ কিউ এম মুজাহিদুল ইসলাম
রেজিস্ট্রার

ডা. মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসাইন
রেজিস্ট্রার

পেডিয়াট্রিক

ডা. রোকসানা আহমেদ
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান

অধ্যাপক ডা. মো. মুসলিম উদ্দিন
অধ্যাপক

ডা. নাজমুল হুদা রিপন
সহযোগী অধ্যাপক

ডা. মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক

ডা. তাজরিন রহমান
রেজিস্ট্রার

ডার্মাটোলজি

অধ্যাপক ডা. মনসুরুল আলম
বিভাগীয় প্রধান

ডা. শামিম আরা
সহযোগী অধ্যাপক

ডা. উম্মে আসমা
রেজিস্ট্রার

কার্ডিওলজি

ডা. মোঃ আখতারুল ইসলাম চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান

ডা. মোঃ এনামুল হক
সহকারী অধ্যাপক

গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি

ডা. সৈয়দ আরাফাত মহিউদ্দিন
সহকারী অধ্যাপক

এন্ডোক্রাইনোলজি

ডা. মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
সহকারী অধ্যাপক

নিউরোলজি

ডা. রিজওয়ান আহমাদ
সহকারী অধ্যাপক

ফিজিক্যাল মেডিসিন

ডা. সাইফুল করিম মোঃ ইলিয়াস
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান

ডা. মোঃ আরমান
সহকারী অধ্যাপক

সাইকিয়াট্রি

ডা. এ এস এম রেদওয়ান
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান

ডা. মোঃ নুরুন্নবী ইসলাম
রেজিস্ট্রার

জেনারেল সার্জারি

ডা. মোঃ মেশকাত উদ্দিন খান
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান

অধ্যাপক ডা. মোঃ মাজহারুল হক
অধ্যাপক

ডা. মোহাম্মদ আকরামুল আলম সিমন
সহকারী অধ্যাপক

ডা. শারমিন আকতার
সহকারী অধ্যাপক

ডা. জয়নব আল গাজ্জালী
রেজিস্ট্রার

ডা. শাহেদ সাজেদ উল্লাহ
রেজিস্ট্রার

ইউরোলজি

ডা. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান

অধ্যাপক ডা. আবদুস সালাম
অধ্যাপক

ডা. মোঃ আবু বক্কর
রেজিস্ট্রার

অ্যানেসথেসিওলজি

ডা. নুর উদ্দীন চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান

ডা. মোহাম্মদ রফিকুল আলম
রেজিস্ট্রার

ইএনটি

ডা. মোহাম্মদ শাহেদ আলী খান
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান

ডা. আমিনুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক

অপথ্যালমোলজি

অধ্যাপক ডা. মোঃ খুরশিদ আলম
বিভাগীয় প্রধান

ডা. জয়নুল আবেদীন
সহকারী অধ্যাপক

ডা. মোঃ ফারুকুল ইসলাম
রেজিস্ট্রার

অর্থোপেডিক

ডা. মোঃ সাইফুদ্দিন রোকন
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান

ডা. এস এম কাউসার
সহকারী অধ্যাপক

ডা. মোঃ মহিউদ্দিন
রেজিস্ট্রার

পেডিয়াট্রিক সার্জারি

ডা. মোহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক

রেডিওলজি

ডা. নাহিদ ফারজানা ইসলাম
রেজিস্ট্রার

গাইনী এন্ড অব্স

অধ্যাপক ডা. মুসলিনা আখতার
বিভাগীয় প্রধান

ডা. শামিমা আখতার
সহযোগী অধ্যাপক

ডা. তাসলিমা আকতার
সহযোগী অধ্যাপক

ডা. ফারজানা চৌধুরী
সহযোগী অধ্যাপক

ডা. কোহিনুর নাহার চৌধুরী
সহযোগী অধ্যাপক

ডা. বেগম তাহমিনা সুলতানা
সহকারী অধ্যাপক

ডা. নাজমিন সুলতানা
সহকারী অধ্যাপক

ডা. সাইয়েদা মেহেরুন্নেসা
রেজিস্ট্রার

ডা. মরিয়ম সুলতানা
রেজিস্ট্রার

মেডিকেল এডুকেশন

ডা. আফরোজা হক
সহযোগী অধ্যাপক

গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা

জুলাই অভ্যুত্থানে শিক্ষক সমাজের ভূমিকা

- প্রফেসর মোহাম্মদ নুরুন্নবী
সেক্রেটারি (ভারপ্রাপ্ত)
ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ।

২০২৪ সালের জুলাই মাস বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। দেশের আপামর ছাত্র-জনতার বলিষ্ঠ ও কৌশলী আন্দোলনে জগদ্দল পাথরের মতো বসে থাকা ফ্যাসিস্ট হাসিনার পতন হয়েছিল ২৪ এর ৩৬ জুলাই। আন্দোলন নেতৃত্বদানকারী ছাত্র সমন্বয়কবৃন্দের ঘোষণা ছিল স্বৈরশাসকের পতন না হওয়া পর্যন্ত জুলাই মাস শেষ হবে না। তাই ৫ আগস্ট স্বৈরাচারের পতন দিনটিকে ইতিহাসে ৩৬ জুলাই হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

জুলাই বিপ্লবের সূচনা মূলত: সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এ আন্দোলনের দানা বেঁধেছিল ২০১৮ সালে। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে সরকার ২০১৮ সালের ৪ অক্টোবর সরকারি চাকরিতে ৯ম গ্রেড এবং ১০ম-১৩তম গ্রেডের (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি) পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সকল কোটা বাতিল করে পরিপত্র জারি করতে বাধ্য করে। কিন্তু ২০২৪ সালের ৫ জুন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ সরকারের ইঙ্গিতে ২০১৮ সালে ৪ অক্টোবর জারিকৃত পরিপত্রকে বাতিল এবং অবৈধ ঘোষণা করে। ৬ জুন আদালতের রায় এবং কোটা বাতিলের দাবীতে দেশব্যাপী শিক্ষার্থী এবং চাকরি প্রত্যাশীরা বিক্ষোভ শুরু করে। মূলত: এখান থেকে ধাপে ধাপে এ আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে শেখ হাসিনার পদত্যাগের একদফা দাবীতে পরিণত হয়।

সারাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকগণ শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকার ঘোষিত সার্বজনীন পেনশন স্কীম "প্রত্যয়" এর আওতাভুক্ত করার প্রতিবাদে ১লা জুলাই-২০২৪ থেকে আন্দোলনে নামেন।

'প্রত্যয়' কর্মসূচির আওতায় ১ জুলাই থেকে চাকরিতে যোগদানকৃত শিক্ষকগণ মাসে মাসে মূল বেতনের ১০% পেনশন স্কীমে চাঁদা প্রদান করবেন। বিনিময়ে অবসরে শিক্ষক আজীবন পেনশন সুবিধা পেলেও তাঁর স্ত্রী বা পরিবার আজীবন নয় সর্বোচ্চ ৭৫ বছর পর্যন্ত পেনশন প্রাপ্য হবেন। অথচ বর্তমান নন ফান্ড পদ্ধতিতে পেনশন স্কীমে কোন চাঁদা না দিয়েও তিনি নিজে এবং স্ত্রী আজীবন পেনশন সুবিধা প্রাপ্ত হচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকগণ এ বৈষম্য পূর্ণ পেনশন স্কীমের বিরুদ্ধে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে আন্দোলন শুরু করেন। ফলে ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের চলমান কোটা আন্দোলনে নতুন গতি পায়। একদিকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকগণের পেনশন স্কীম 'প্রত্যয়' বিরোধী আন্দোলন অপরদিকে ছাত্রদের কোটাবিরোধী আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠগুলোর পরিবেশ। ছাত্ররা শিক্ষকগনের আন্দোলনে প্রকাশ্য সমর্থন এবং ছাত্রদের আন্দোলনে শিক্ষকগণের নৈতিক সমর্থনের কারণে এ আন্দোলন যুগপৎ আন্দোলনে রূপ নেয়।

৬ জুন থেকে শুরু হওয়া ছাত্রদের কোটা বিরোধী নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে থাকলেও ১৪ জুলাই সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্দোলনকারীদের রাজাকারের নাতি-পুতি, জনাব ওবায়দুল কাদের আন্দোলনকারীদের শায়েস্তা করার জন্য ছাত্রলীগই যথেষ্ট এবং ছাত্রলীগের সভাপতি সভাপতি সাদ্দাম হোসেন আন্দোলনকারীদের "শেষ দেখে ছাড়বেন" ইত্যাদি উসকানিমূলক বক্তব্য এবং ঢাবি ক্যাম্পাস সহ দেশের অসংখ্য জনগণ ছাত্রলীগ আন্দোলনকারীদের ক্যাডারদের কর্তৃক আন্দোলনকারীদের উপর নজিরবিহীন ও নৃশংস হামলা আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এতে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ প্রতিবাদ ও নিন্দা করেন। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে সংহতি প্রকাশ করতে শুরু করে। পরবর্তী ঢাবি ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশী হামলা এবং গ্রেফতার এর প্রতিবাদে অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুলের নেতৃত্বে বেশ কিছু নারী শিক্ষক সরাসরি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং একজন নারী শিক্ষক পুলিশের কাছ থেকে আটক শিক্ষার্থীকে ছাড়াতে গিয়ে ধস্তাধস্তিতে পড়ে গিয়ে আহতও হন। ফ্যাসিস্টদের ভয়ে যেখানে অধিকাংশ শিক্ষক নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছিলেন। সেখানে এ শিক্ষকগণ সরকার এবং পুলিশ প্রশাসনের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে আটককৃত শিক্ষার্থীদের থানা থেকে ছাড়িয়ে আনেন। ঢাবি-র গুটি কয়েক শিক্ষকের ভূমিকা সারাদেশের শিক্ষার্থীদের ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে শিক্ষকগণ পাশে থাকায় শক্তি সঞ্চয়ের পাশাপাশি আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের মানসিক ও সাহস বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেয় এবং আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে।

অন্য দিকে ট্রান্সজেন্ডার বিষয়ক শরিফার গল্প সংযোজনের প্রতিবাদস্বরূপ বইয়ের পাতা ছিঁড়ে আলোচিত ও চাকরি হারানো ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিষয়ের শিক্ষক জনাব আসিফ মাহতাবকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার এবং ডিবি কার্যালয়ে নির্মম নির্যাতনে সারাদেশের মানুষ এবং ছাত্র-শিক্ষকগণ ক্রমেই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। আন্দোলনের মাঠে শিক্ষক ও ছাত্র সমাজ, সরকার প্রধান থেকে শুরু করে প্রশাসনের দায়িত্বশীল মহল আন্দোলন ও আন্দোলনকারী নিয়ে ট্রল ইত্যাদির কারণে সহিংসতায় রূপ নেয় এবং ১৬ জুলাই রংপুরে আবু সাঈদকে পুলিশ সরকারি গুলি করে হত্যা করায় আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। এরপর থেকে সরকার ব্যাপকভাবে শক্তি প্রয়োগ ও নিরস্ত্র শিক্ষার্থীদের হত্যা গোটাজাতির বিবেককে নাড়িয়ে দিয়ে ক্রমের আন্দোলন সরকারের নিয়ন্ত্রণের গভীরে চলে যায়।

সরকার দাবী মেনে নেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকগণ ৪ আগস্ট তাদের আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করলেও ততক্ষণে সর্বস্তরের শিক্ষক সমাজ আন্দোলনকারী ছাত্র জনতার সাথে রাজপথে নেমে পড়েন। আর এরপর দিন ৫ আগস্ট (৩৬ জুলাই) দেশের পূর্ব দিগন্তে নতুন আর একটি লাল-সবুজের সূর্য উদিত হয়। অদম্য এ জাতিকে দমিয়ে আজীবন ক্ষমতায় থাকার স্বপ্ন-ভঙ্গ দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে নিকৃষ্ট স্বৈরশাসক দেশে ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

হীরক রাজার দেশে

- অধ্যাপক ডাঃ এম জালাল উদ্দিন
চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ

সম্ভবত একাশি সালের ঘটনা। আমরা তখন চট্টগ্রাম কলেজের শেরেবাংলা ছাত্রাবাসের আবাসিক ছাত্র। আর্ন্তজাতিক Film festival উপলক্ষে কয়েকটি সিনেমা দেখানো হবে টেলিভিশনে। ছাত্রাবাসের কমন রুমে উপচে পড়া ভীড়। সিনেমার নাম 'হীরক রাজার দেশে'।

বিশ্ববিখ্যাত চিত্র প্রযোজক সত্যজিৎ রায়ের অসাধারণ শিল্পকর্ম 'হীরক রাজার দেশে'। এই সিনেমায় স্বৈরাচারের চরিত্র, কার্যকলাপ এবং শেষ পরিণতি দেখানো হয়েছে সুনিপূণভাবে। আরো দুটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্যে এই সিনেমাটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। নারী চরিত্রবিহীন এই সিনেমাটির সংলাপ পুরোটাই ছন্দময়।

স্বৈরশাসকদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য 'King's will is law'। তারা তাদের ছায়ায় কাউকে বাড়তে দেয় না। প্রতিপক্ষকে দমন করে অনৈতিক এবং নির্মমভাবে। নিজেকে সবসময় নির্ভুল ভাবে এবং একসময় নিজেকে ফেরাউনের মতো খোদা ভাবে। তবে স্বৈরশাসকদের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রমও দেখা যায়। এরা কিছুটা ন্যায়পরায়ণ ও প্রজাহিতৈষী হয় (Benevolent Dictator)। অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রতাপশালী স্বৈরশাসক আইয়ুব খান কিছুটা Benevolent Dictator ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতায় বিরোধীমত দমন করে কিছুটা নির্বিঘ্নে দেশ শাসন করছিলেন। সবাই ধরে নিয়েছিল তিনি আজীবন থাকবেন। এই প্রেক্ষাপটে এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকেরা মওলানা মওদূদীকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করলেন আইয়ুব খানের শাসন সম্পর্কে। মওলানা সাহেব বললেন "স্বৈরশাসকেরা একে একে তাদের পতনের সব পথ বন্ধ করেন। কিন্তু যেটাতে পতন হবে সেটা বন্ধ করতে ভুলে যান"। অন্য এক প্রশ্নের জবাবে বললেন, "আমাদের দূর্ভাগ্য আমরা চাই একটি আমাদের শাসকেরা দেয় অন্যটি"। মওলানার কথাই সত্য প্রমাণিত হয়। উনসত্তর এর গণ আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন ঘটে। উনার পরে আসলেন লম্পট দুশ্চরিত্র ইয়াহিয়া খান। উনার পতন ঘটে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাহাত্তর সালে।

আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা নিয়ে শেখ মুজিব আসেন ক্ষমতায়। অচিরেই তিনি অযোগ্য এবং স্বৈরশাসক হিসেবে নিজেকে প্রতিপন্ন করেন। পরিণতি হলো খুবই নির্মম ভয়াবহ। পঁচাত্তরের পট পরিবর্তনের পরে ক্ষমতায় আসেন জিয়াউর রহমান। উনার আগমনটা অগণতান্ত্রিক হলেও কার্যক্রমে স্বৈরশাসকের বৈশিষ্ট্য খুজে পাওয়া যায় না। দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রে জিয়ার শাহাদতের পরে আসেন এরশাদ। তিনি দুশ্চরিত্র, দুর্নীতিবাজ এবং স্বৈরশাসক হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে বেশিদিন সময় নেননি। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থানে তার অপমানজনক পতন ঘটে নব্বই সালে। তারপর ১৫-১৬ বছর দেশ মোটামুটি সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়। তারপর আসে ইতিহাসের অন্যতম নিকৃষ্ট স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা। প্রায় সতের বছরের জগদ্দল পাথরে জনগণের নাভিশ্বাস উঠে। সবাই ধরে নিয়েছিল তিনি আমৃত্যু ক্ষমতায় থাকবেন। কিন্তু গুম, খুন ও বিভীষিকাময় হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েও রেহাই পেলেন না। গণ-অভ্যুত্থানে তার পতন ঘটে হীরক রাজার দেশের রাজার মতোঃ

"দড়ি ধরে মারো টান
রাজা হবে খান খান"

৩৬ জুলাই
এক মহাবিপ্লবের নাম

- ডাঃ মোহাম্মদ নাজমুল হুদা রিপন
সহযোগী অধ্যাপক, শিশু বিভাগ

৩৬ জুলাই
তারিখটা বড় অদ্ভুত শোনায়। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে এর অস্তিত্ব খুঁজে পাবে না। আমি জানি না পৃথিবীর আর কোনো এমন অদ্ভুত নামকরণ আছে কিনা। মনে হয় না। ২১শে ফেব্রুয়ারী যেমন ২য় টা নেই পৃথিবীর কোন দেশে, ৩৬ জুলাই ও ঠিক তেমনি। কিভাবে এটা পেলাম আমরা ৩৬ জুলাই বা ৫ আগস্ট ২০২৪?

আগস্ট এলেই আমরা একটু স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ি। সেটা '৭৫ হোক কিংবা '২৪ হোক। আমরা যারা '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি। কিছুটা হলেও বুঝেছি, তারা দেখেছি যুদ্ধপরবর্তী একটা বিধ্বস্ত দেশের করুণ অবস্থা। পরাজিত পাকিস্তানী বাহিনীর ঘর বাড়ী, কারখানাগুলি একটা দলের বা ব্যক্তির স্বজনরা কিভাবে লুটপাট করে দখল করলো। সীমাহীন দুর্নীতি, লুটপাট আর গুমহত্যার মহড়া চলেছে সর্বত্র। এসবের মাঝেই দেশে '৭৪ এ ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ হানা দিলো। হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে মারা পড়লো। '৭৫ এ এক সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হলেন দেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে। তখন আগস্ট এলেই দেশে কিছু মানুষ বা গোষ্ঠীর স্বাধীনতা আর ব্যক্তি বন্দনা শুরু হয়ে যেতো। পাশাপাশি চলতো চাঁদাবাজি, কাঙালী ভোজ আর মিথ্যার অত্যাচার।

সরকারী অর্থে পোষ্য, জাবর কাটা সাংবাদিক আর গৃহপালিত বুদ্ধিজীবীদের মুখের ফেনায় আগস্টকে মহান বানিয়ে ফেলতো। চারিদিকে চলতো তথাকথিত শোকের মাতম আর চাপাবাজি।

২০২৪ এর আগস্ট একটা দ্রোহের নাম, ৩৬ জুলাই তার অলংকারিক নাম। যার সূত্রপাত মূলতঃ কোটা বিরোধী অন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরা কোটার জোরে ঢুকে যাবে সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষাগুলিতে মেধাহীন হওয়া সত্ত্বেও, আর যোগ্য প্রার্থীরা বেকার হয়ে, আত্মহননের পথ বেছে নেবে। কোটা আন্দোলনের সৈনিকরা হয়ে গেলো 'রাজাকারের নাতিপুতি', ঐ ফ্যাসিবাদের রাণীর ভাষায়। বৈষম্যের এই স্ফুলিঙ্গ একসময় রূপ নেয় দাবানলের, শুরু হয় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন। সরকার তার ভয়ংকর চেহারা দেখাতে শুরু করে। পেটোয়া বাহিনীর চর্তুমুখী আক্রমণ, নির্বিচারে নৃশংস হত্যা, ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়ায় একসময় পেশাজীবী, শ্রমজীবী মানুষেরাও এই আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। শুরু হলো দুর্বার আন্দোলন। ১৬ই জুলাই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্য সারথী আবু সাঈদের শহীদ হওয়ার মধ্যে দিয়ে শুরু হলো নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ যার নির্দেশদাতা ফ্যাসিস্ট রানী স্বয়ং। তারপর আরো কত প্রাণ ঝরে গেলো, মীর মুগ্ধ, রাফি, ওয়াসীম সিয়াম, ফারুক, নাম না জানা কত সহস্য প্রাণ। ঝরে পড়লো কালো রাজপথে, রক্তে হলো লাল।

আকাশে উড়ন্ত যান্ত্রিক দানবের গুলিতে প্রাণহীন হয়ে ঝরে পড়লো ঘরের শিশুরা, ছাদের খেলারত শিশুরা।

এত এত তাজা প্রাণ, এত আন্দোলন, জনতার বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ার রোখা যায়নি। কোটা আন্দোলন একসময় রূপ নেয়। আর 'এক দফা এক দাবী'র মহাবিপ্লবের। জনতার সেই মহাপ্লাবনের তোড়ে ভেসে গেলো অত্যাচারী, ফ্যাসিস্টের মসনদ, পালিয়ে গেলো মন্ত্রীসান্ত্রী আর সেপাই দলপতিরা তস্করের মতো। প্রাণ বাচাতে রাক্ষুসী রানী চুপিসারে তল্পিতল্পাসহ উড়াল পথে পাড়ি জমালো শত্রু প্রতিবেশীর দেশের ডেরায়। ফ্যাসিবাদ হাসিনার বাসভবন জনতার প্রচণ্ড রোষের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। জনতার শক্তিই যে সবচে বড় শক্তি আবার প্রমানিত হলো।

দিনটা ছিলো ৫ই আগস্ট ২০২৪। তবুও ইতিহাসের এই দিনটা সোনার হরফে লেখা থাকবে। বাংগালী জাতীয় হৃদয়েও থাকবে ৩৬ জুলাই ২০২৪ এক মহাবিপ্লবের নাম।

মোনা লিসা'র হাসি- মূর্ত ও বিমূর্ত

- অধ্যাপক ডা. এ. জেড. এম. আশেক-ই-এলাহী
অধ্যাপক (চ.দা.), ফার্মাকলোজি বিভাগ সি. আই. এম. সি

ইটালিয়ান চিত্রকর লিওনার্দো ভিঞ্চির (১৪৫২-১৫১৯) বিখ্যাত চিত্রকর্ম 'মোনা লিসা', যেটি এযাবৎ বিশ্বের সর্বাধিক প্রর্দশিত, আলোচিত এবং সর্বাধিক মূল্যমানের (৩৭৬১ কোটি) কালজয়ী অনুপম চিত্রকর্ম যাতে একজন রহস্যময়ী নারীর হাসিকে ভিজ্যুয়াল অপটিক্সের মাধ্যমে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে দূর থেকে দেখলে মনে হয় হাসছে অথচ কাছে গেলে হাসিটা মিলিয়ে যাচ্ছে। আবার যে কোন এঙ্গেলে দেখা হোক না কেন মনে হয় অপলক দৃষ্টিতে দর্শকের দিকে তাকিয়ে আছে। মূল মডেল ইটালিয়ান নারী (লিসা গ্যারাদিনি) বাস্তবে যাই হোক শিল্পীর তুলিতে অসাধারণ ভঙ্গিতে পরিস্ফূত হয়ে উঠেছে। কবির কথায়,

'সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা তা সত্য নহে, কবি তব মনভূমি ...'।

আমরা জানি হাসিতে চারটি মাংসপেশী সক্রিয় থাকে, তার মধ্যে 'জাইগোম্যাটিকাস মেজর' ঠোঁটের কর্ণারকে টেনে ধরে রহস্যময়তা ফুটিয়ে তুলে। এই মাসল চতুষ্টয়ের সঞ্চালনে মাত্র কয়েক ক্যালরি খরচ হলেও নিরবে নিক্ষিপ্ত এই মিসাইলে ধরাশায়ী হয় অনেক মহীরূহ, ঘটে অনেক আকাংক্ষিত প্রাপ্তি। প্রাচ্য-প্রতীচ্য সব শিল্প-সাহিত্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীদের অঙ্গভঙ্গিমা নিয়ে বেশি আলোচনা হয়। কারণ আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে নারীরা কোভার্ট (রহস্যাবৃত্ত), ছেলেরা ওভার্ট (খোলামেলা)। একারণে কবি বলেন,

'নারীরা দোলক শুধু হাসি অশ্রু মাঝ,
এই কাঁদে এই হাসে এই তার কাজ'।

আমাদের প্রেম-বিরহের কবি নজরুল নিজের প্রেয়সীকে সখেদে বলেন,

'আকাশের মত তোমাদের চোখে সহসা বাদল নামে,
রোদ্রের তাপ ফুটে উঠে সখি সহসা সে মেঘ থেমে'।

আলোচ্য চিত্রকর্মটিতে কোন প্রসাধনীর ব্যবহার স্পষ্ট নহে, এমনকি এ লাস্যময়ী নারীর ঠোঁটেও নেই কোন রঞ্জক বা লিপস্টিকের চিহ্ন, যা প্রসাধনী প্রস্তুতকারকদের হতাশ করার কথা। অথচ আটলান্টিকের এপারে বাঙ্গাল-মূলকে মহাকবি 'আলাউল' (১৬০৭-১৬৭৩) তার নায়িকা পদ্মাবতীর রূপসৌন্দর্য বর্ণনাকালে ঠোঁটকে রাঙাতে ভুলেননি। মধ্যযুগের কবিরা নায়িকাদের রূপ বর্ণনায় শুধু মুখের উপর ভর করেননি, যেমন পদ্মাবতীর বর্ণনায় -

'সুচারু সুরস অতি রাতুল অধর,
লাজে বিশ্ব বান্দুলি গমন বনান্তর।
রক্ত, উৎপল লাজে কালান্তর হৈশে,
তাম্বুল রাতুল হইল অধর পরশে'।

আলাউলের কথায়, নায়িকার টুকটুকে লাল ঠোঁটের পরশে পান চিরদিনের জন্য লাল হয়ে গেল এবং রক্তিম বর্ণের মণিমুক্তারা লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গেল। মধ্যযুগের কবিদের এ দারুণ ভঙ্গিমায় প্রকাশিত নারী সৌন্দর্য তৈলচিত্রে ধারণ করার মত কোন চিত্রশিল্পী হয়ত ছিল না, এ যুগের উপমহাদেশের খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী ফিদা হাসান হয়ত বা তার তুলিতে ধারণ করতে পারতেন।

এবার আনন্দ-বেদনার প্রকাশ ভঙ্গি নিয়ে দেশীয় প্রেক্ষাপটে কিছু আলোচনা করা যাক। বুকের মাঝে জমে থাকা আনন্দ বেদনার প্রবাহ প্রতিবিম্বিত হওয়ার কথা 'মুখে'। মানব-মানবীর হাসি-কান্না নিয়ে সাহিত্যিকদের পদচারণা। আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম যিনি দারিদ্রের কষাঘাত, প্রেম-বিরহের মর্মজ্বালা বুকে পুষেও হৈ-হুল্লোড়ে কাটানো জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন, তার এ আপাতঃ উচ্ছাসের তলে কত বড় বেদনার সাগর লুকায়িত ছিল তা কিছু কিছু লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। যেমন,

"তুমি বুঝিবে না আলো দিতে পুড়ে কত প্রদীপের প্রাণ"।

"বড় কথা বড় ভাব আসে না মাথায়,
বন্ধু গো বড় দুঃখে
অমর কাব্য লিখিও তোমরা
যাহারা আছো সুখে"।

অন্যত্র, সরাসরি বলেই ফেললেন,

"হায়! তুমি বুঝিবে না!
হাসির ফূর্তি উড়ায় যে
তার অশ্রুর কত দেনা"।

মানবকুলের অভিব্যক্তির দ্বৈত রূপ আমরা প্রাচুর্যে লালিত আপাত গাম্ভীর্যে ভরা ঋষি কবি রবিঠাকুরের লেখাতেও পাই। যেমন,

"আমারে পাছে সহজে বুঝ
তাইত এত লীলার ছল,
উপরে যার হাসির ছটা
ভিতরে তার চোখের জল"।

এ চোখের জল পরিমাপযোগ্য নয়। একথা স্পষ্ট যে অনেক সময় আমাদের বাহ্যিক মুখাবয়বে যে অভিব্যক্তি ফুটে উঠে তা মনের বার্তাকে প্রতিফলিত করে না। আমাদের আলোচ্য চিত্রকর্মের "মোনা লিসা"র এ রহস্যময় হাসিকে অনেক সমালোচক বলেছেন, এটি হাসি নয়, হাসির ভঙ্গিতে শ্লেষ!! এ রম্য আলোচনার ইতি টানছি রবীন্দ্রনাথের সোনার তরীর 'হিং টিং ছট' কবিতার প্যারোডি দিয়ে

"এসো ভাই তোলো হাই শুয়ে পড় চিত,
অনিশ্চিত সংসারে এ কথা নিশ্চিত;
হাসিকান্নার অভিনয় এজগতে হায়,
সকলি মিথ্যা সকলি মায়াময়।
অভিজ্ঞজনের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুন্যবান"।

ডাস্ট উই উইল বি

- ডা. আলী আসাদুল্লাহ হোসাইনী

-" রেডিয়াল নার্ভের কোর্স ডিস্ট্রিবিউশান বল।"
কিছুক্ষণ চুপচাপ স্যারের দিকে তাকিয়ে রইল ফরিদ।
-* কি রে ভ্যাবলা, প্যাঁচার মত ড্যাবড্যাব করে চাইয়া রইছস কেন?"
-" স্যার পারিনা।"
-"পড়িসনি?"
-" পড়েছি। কিছু বুঝিনি স্যার। এজন্য কিছু মনে নাই।"
-"কেন বুঝিসনি?" -"
স্যার, আপনি যখন কেডেভার ডিসেকশান করছিলেন সামনে আসতে পারিনাই। আমি লম্বা বলে সবাই পিছনে ঠেলে দেয়। কিছু দেখিনাই ভালোমতো। পরে পড়েও আগামাথা কিছু
বুঝিনাই।"
-'আচ্ছা! দেখসনাই কিছু তাইলে? ম্যাক্সিমামই তো ভাল বলতে পারছে। ওরা কি সব দেখেছে?"
-"স্যার, ওরা ঠাটা মুখস্থ করে এসেছে। আমিও মুখস্থ করে আসতাম। কিন্তু আমার মুখস্থবিদ্যা ভালো না। তাই চেষ্টা করেও পারিনাই।"
আজাদ স্যারের হঠাৎ ছেলেটাকে ভালো লেগে গেলো। একেবারে সরল, বাচ্চাছেলের মত! ওনার আজকে সন্ধ্যায় কাজকর্ম নাই। ভাবলেন বঞ্চিত ছেলেগুলোকে একটু পড়িয়ে দেয়া যাক। " আচ্ছা, তুই আজকে মাগরিবের নামাজ পড়ে সোজা ডিসেকশান হলে আসবি। ডিসেকশান দেখাব তোরে। সাথে গ্লাভস নিয়ে আসবি।" ফরিদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। "আচ্ছা স্যার। খুব উপকার হবে স্যার।"
-'আর শোন, যারা ডিসেকশান দেখেনি ওদেরও আসতে বলিস তোর সাথে ইনক্লুডিং অল দ্যা লম্বুস।"
-"আচ্ছা স্যার।"
মাগরিবের পর গুটিগুটি পায়ে ফরিদ, আজমল আর রোকন ডিসেকশান হলে গিয়ে হাজির। জানালা দিয়ে দেখা যায় আজাদ স্যার হেলেদুলে আসতেছেন মসজিদের দিক থেকে। এসেই
হাঁক দিলেন," নাস্তা করেছিস?' ওরা না সূচক মাথা নাড়ে।
-" আমিও নাস্তা করিনাই। কি খাবি বল? খেতে খেতে পড়া যাক।"
-" স্যার, পরে খাব।"
"গাধা, ব্রেইনে গ্লুকোজ না থাকলে শুধু হাওয়া দিয়ে কি মেমোরি বানাবি?' বলতে বলতে প্যান্টের পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে কচকচে পাঁচশো টাকার নোট বের করে ফরিদকে বললেন," ফরিদ, নে টাকাটা রফিক ভাইকে দে। বাইরে আছে। যা খেতে চাস নিয়ে আসতে বল।" ফরিদ বেরিয়ে যাচ্ছিল। স্যার আবার ডাক দিলেন।" ফরিদ শোন, চা কিন্তু কড়া লিকারের
হবে। যদিও রফিক ভাই জানে, তবুও বলে দিস।" মাথা নেড়ে ফরিদ মৃদু হেসে বেরিয়ে গেলো।
-"এই, শুধু তোরা তিনজনই দেখিসনি?"
-"স্যার আরো কয়েকজন ছিল।"
-"ওরা কই?"
-"টিউশনিতে গেছে স্যার।"
-"বউ বাচ্চা আছে নাকি ওদের?"
-" না স্যার। ফ্যামিলির অবস্থা ভালো না। নিজেদের পড়াশোনার খরচ নিজেরা চালায়।"
-"ও!"
স্যারের কেন যেন মন খারাপ হয়ে গেলো। বাবার পয়সা না থাকলে মেডিকেলে পড়ালেখা একটা বিভীষিকা। তিনি মন খারাপ করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তাঁর হঠাৎ নিজের অতীতের কথা মনে পড়ে গেলো। তাঁর বৃদ্ধ পিতার স্মৃতি। মেডিকেলে চান্স পাওয়ার খবর শুনে তাঁর পিতার খুশি দেখে কো পারেন না যেন এক পাক নেচে নেন। দুহাত তুলে আসমানের দিকে তাকিয়ে বললেন,' আল্লাহ আপনার হাজার শোকর। আমার ছেলেরে আপনি ডাক্তার বানাইছেন।" খুশিতে গদগদ হয়ে ঘরণীকে হাঁক দিয়ে ডেকে বললেন, "অ করিমা! শুনছ, আমাদের আজাদ নাকি ডাক্তারিতে টিকছে!" মা তো খুশিতে বাকবাকুম! মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন," কি কন! আসলেই। আজাদ বুকে আয় বাপ। শ্যামল ডাক্তারও মরে গেলো আর আমার শরীলেও এখন সমস্যার শেষ নাই। বহুদিন আমার মাঞ্জা ব্যথা, পায়ের তলা পুড়ে, গা হলহল করে। আমার ছেলে আমার চিকিৎসা করবে এখন। আমার আর কোন চিন্তা নাই।" স্যার লজ্জা পেয়ে

গেলেন। বললেন,' মা, আমি মাত্র চাল পাইছি। মেডিকেলে যাওয়ার পর আমাকে স্যাররা ওসব শিখাবে। তারপর তোমার চিকিৎসা করব নে।" বলে কিছুক্ষণ তিনি তাঁর বাবার হাসিখুশি চেহারার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। কারণ কিছুক্ষণ পর হয়তো বাবার মুখের হাসি থাকবেনা। খুবই আস্তেআস্তে বলেছিলেন,' বাবা, টিকছি দিনাজপুর মেডিকেলে।' হতাশ কণ্ঠে তাঁর বাবা জনাব বাচ্চু মিয়া বলেন," দিনাজপুর! সেতো অনেক দূরে রে আজাদ।" বলতে বলতে তাঁর মন খারাপ হয়ে গেলো হঠাৎ। ছোট্ট আজাদ স্যারের চেহারায় পরিষ্কার দুঃখবোধ জেগে ওঠলো। তিনি জানতেন বাবার মন খারাপ হবে। অভাবের সংসারে দুটা ভাতই ঠিকমত জুটেনা, শিক্ষা কোত্থেকে জুটবে তাও হাজার মাইল দূরে গিয়ে পড়তে হবে। তাছাড়া ঘরে বাবা মা দুজনেরই বয়স হয়েছে। ছেলে হিসেবে পিতা মাতার অন্তত কাছাকাছি থাকা চাই। আশেপাশে না থাকলে সমস্যা। কত রকমের বিপদাপদ আছে তার ঠিক নেই। তাই বাবার মন খারাপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

মেডিকেলে চান্স পাওয়াটা তাঁর জন্য ছিল মরুভূমিতে ঘর বানানোর মত কঠিন ব্যাপার। নাইন থেকে ছেলেপেলে পড়াতেন। কিছু টাকা জমিয়েছিলেন। কোচিংয়ে পড়ার আগে এলাকার ভার্সিটি পড়ুয়া ছাত্রদের একটা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান কিছু টাকা জোগাড় করে দিয়েছিল। ওরাই আবার কোচিং এর টাকা কেমনে যেন প্রায় ফ্রি করে দিয়েছিল। সেই সুবাদে শহরে গিয়ে কোচিং করেছিলেন। ছিলেন আলফালাহ গলির ঘিঞ্জি একটা জায়গায়। মশার কামড়, পেটে ক্ষুধার কামড় উপেক্ষা করে তিনি তার স্বপ্নকে শেষ হতে দেননি। ডাক্তার হওয়াই ছিল নেশা।

স্কুলে থাকতে বাবার সাথে একদিন বাজারে যাচ্ছিলেন। ভান্ডারীর চায়ের দোকানের সামনে সজল স্যারের সাথে দেখা। স্যার তাঁর বাবাকে বললেন, 'আপনার ছেলে অনেক মেধাবী। সুযোগ পেলে বহুত বড়কিছু হতে পারবে।" মলিন হেসে মনে দুঃখ নিয়ে আস্তে আস্তে সজল স্যারকে বাবা বলেছিলেন,' স্যার, ছেলে আমার বড্ড পরিশ্রমী। সারাদিন স্কুল শেষে আমার সাথে মাঠে গিয়ে কাজ করে। বাড়িতে এসে আবার পড়তে বসে। রাতে কখন ঘুমায় জানিনা। ফজরের সময়ও দেখি পড়ে। কিন্তু কদিনই বা চালাতে পারব ওর পড়ালেখা! স্কুলের ফিস বাড়তেছে, খরচ বাড়তেছে, মেয়েরা বড় হয়ে যাচ্ছে, আমিও বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।' বাবার কথা শুনে ছোট্ট আজাদ স্যারের চোখে পানি টলমল করতে লাগল। উনিও জানেননা এভাবে আর কতদিন সম্ভব। পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মাটিতে দাগ কাটতে কাটতে চোখের পানি আড়াল করার চেষ্টা করতে লাগলেন। তবুও সজল স্যার কিভাবে যেন দেখে ফেললেন। মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন," আজাদ, যে বীজে গাছ হওয়ার সে মরুভূমিতেও গজাবে। আর যে পঁচে যাওয়ার সে উর্বর মাটিতেও পঁচে যাবে। তোরে অনেক বড় হতে হবে..." সজল স্যার উৎসাহ দিলেন বটে কিন্তু তিনি জানেন এই সংসারের বাস্তবতা। আজাদ খুবই সম্ভাবনাময় হলেও কদ্দুর আগাতে পারবে সেটা নিয়ে তিনি যথেষ্ট শংকিত। পরিচর্যার অভাবে কতফুল অকালে ঝরে যায়! যত্নের অভাবে কত লোহার পাতে জং ধরে যায়! দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বাজারের দিকে হাটতে লাগলেন।

তখন থেকে তাঁর জিদ আরও বেড়ে যায়। যার ফলাফল এখন সামনে। কিন্তু এবার তিনি আসলেই শংকিত হয়ে পড়লেন। বহুদূরে যাওয়া, অনেক টাকা ভর্তি ফি, কি করবেন না করবেন আসলেই তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না। তাঁর বাবা ধরা গলায় আস্তে আস্তে বলেছিলেন, "চট্টগ্রাম শহরে যাওয়ার পয়সা আমি তোমারে কখনো দিতে পারিনাই। দিনাজপুরে যাওয়ার পয়সা কোত্থেকে দিব বাবা?" ধারকর্জ করে, এলাকার বদান্য লোকদের থেকে কিছু সাহায্য নিয়ে, ভার্সিটি পড়ুয়া ছেলেদের সহযোগিতায় কোনমতে তিনি মেডিকেলে ভর্তি হয়েছিলেন। ফার্স্ট ইয়ার থেকে টিউশনি করাতেন। খাবার, পড়াশোনা, নিজের খরচ নিজেই চালাতেন। বই নিতেন বড়ভাইদের থেকে- পুরনো বই। কেউ এমনি এমনি দিয়ে দিত আবার কেউ বিক্রি করে দিত অল্প দামে। হোস্টেলের অখাদ্য, দারিদ্রতা, পড়াশোনার অমানুষিক চাপ সবমিলিয়ে কিযে হাঁসফাঁস অবস্থা ছিল বলার মত না। এখনো যে খুব ভালো অবস্থায় আছেন তা না। এমবিবিএস পাস করার পর বিসিএস এরপর এ ঘাট ও ঘাট করে মেডিকেলে আপাতত এনাটমির লেকচারার। ডিগ্রিতে এখনো ঢুকেননি। বিয়ে করা হয়নি এখনো। বাবা মারা গেলেন দুবছর হয়ে গেলো। বাড়ির খরচ, বোনদের পড়াশোনা, তাদের বিয়ে দেয়া সব দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে। এখনো সংগ্রামের জীবন চলমান। এদেশে পয়সাহীনদের জন্য মেডিকেলে পড়াশোনা একটা ভয়াবহ বিপর্যয়ের ব্যাপার!

ফরিদ, রোকন, আজমল তাদের স্যারকে আনমনা হয়ে যেতে দেখে চুপচাপ বসে রইল। রফিক ভাই এসে নিঃশব্দে নাস্তা দিয়ে চলে গেলেন। হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে স্যার দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফরিদের দিকে মনোযোগ দিয়ে বললেন

-* চল তাইলে শুরু করা যাক। গ্লাভস দে। আচ্ছা চল আগে খাওয়া দাওয়া করে নিই।" নাস্তা করতে করতে বললেন,' বুঝলি তোরা? আমাদের সার্জারীর শহীদ স্যার রুটিন ওটির দিন আটটা পরোটা খেয়ে মাঠে নামতেন। খাওয়া দাওয়া না করে কিয়ের জীবন!' স্কুলদেহী ভোজনরসিক আজমলকে রোকন খোঁচা দিয়ে কানেকানে বলে, স্যারতো দেখি তোর বড়ভাই!" আজমল চোখ পাকিয়ে রোকনের দিকে তাকায় আর ঠোটে আঙ্গুল ঠেকিয়ে একটু মজার ভঙ্গি করে," শসসস। খাওয়ার সময় কথা বলা নিষেধ। খেতে দে ডিস্টার্ব করিস না।' ফরিদ আর রোকন খিকখিক করে হাসতে থাকে।

খাওয়া দাওয়া শেষে স্যার বললেন," চল শুরু করি।" গতক্লাসে কেডেভারের রাইট আপার লিম্ব ডিসেকশান করেছেন এবার লেফটে ধরলেন।

-"এই দেখ, স্কালপেল নিবি কলমের মত করে। তারপর সোজা টান। গরুর চামড়া আলাদা করছিস কখনো?"

-"না স্যার, ভয় লাগে।"

-"ধুর গাধা, ভয়ের কি আছে। ঐ সেম কাটাকাটি। এইখানে তুই শুধু একটা মডিফাইড কসাই। হাহাহা"

স্যার ডিসেকশান করতেছেন আর মাসল, নার্ভ আর ভেসেলগুলোর সুক্ষাতিসুক্ষ বর্ণনা দিচ্ছেন। ফরিদের এত ভাল লাগছিল বলার মত না। ভীতিও কেটে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে গ্লাভস পড়ে
এ রকম কাটাকাটি করতে না পারলে জিন্দেগী বৃথা। আজমল মুগ্ধচোখে স্যারকে বলে "স্যার, আপনি সার্জারী করেন?"
-" ইন্টার্নশিপে থাকতে ওটিতে ব্যাপক সময় দিয়েছিলাম। এখন চাকরী বাকরির জন্য পারিনা। এই মাস্টারি টাস্টারি এগুলা ভ্যাবলা মার্কা চাকরী। ওটিতে কোপাকুপি ছাড়া শান্তি আছে রে? সামনে রেসিডেন্সি দিব। অর্থোপেডিক্সে। তখন আবার শুরু করব ইনশাআল্লাহ।" স্যার শার্টের বাম হাতা নিচের দিকে নেমে যাওয়ায় ফরিদকে বললেন,' এই হাতাটা গুটাই দে। একেবারে কনুইর ওপর নিয়ে যা। কিছুক্ষণ পরপর এ ব্যাটা নেমে যায়।"
-"আচ্ছা স্যার।" বলে সে স্যারের শার্টের হাতা গুটানো শুরু করে। হাতা গুটানোর সময় ফরিদ দেখল স্যারের লেফট আর্মে বিশাল একটা স্কারমার্ক। জিজ্ঞেস করে, "স্যার এটা কিসের দাগ?"" আম ফ্র্যাকচার হইছিল ছোটকালে।' মুখে কৌতুক নিয়ে স্যার ফরিদের প্রশ্নের উত্তর দেন। ফরিদ সাতপাঁচ ভেবে স্যারকে জিজ্ঞেস করে, " স্যার আম ফ্র্যাকচার কি?" স্যার অট্টহাসি দিয়ে ওঠলেন। কেডেভারের লেফট হিউমেরাসের লোয়ার এন্ড দেখিয়ে বললেন, "বাচ্চারা আমের সিজনে গাছে আম পাড়তে ওঠে না? যদি গাছ থেকে পড়ে যায় ম্যাক্সিমাম টাইমে হিউমেরাসের এই জায়গায় একটা ফ্র্যাকচার হয়। আমাদের আইয়ুব আলী স্যার এটারে বলতেন আম ফ্র্যাকচার।' মৃদুভাষী রোকন বলে, 'স্যার আপনিও আম পাড়তে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন?"
-"হুম। আমাদের প্রতিবেশী ছিল ছফা মাস্টার। যেই লেভেলের গালিগালাজ করে এ লোক! আমরা সেই ডরাইতাম ওনারে। কিন্তু ওনার বাড়ির পিছনে একটা আম গাছ ছিল। লোকটার ভাষা খারাপ হলেও আম কিন্তু সেই মিষ্টি! তো আম চুরি করার জন্য মাত্র উঠছি এই টাইমেই ব্যাটা কোত্থেকে হাজির। সাথে যারা ছিল সবাই যে যার মত পালাল। কিন্তু আমি মগডালে তখন। তড়িঘড়ি করে নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেছি। আর কিছু মনে নাই। হুশ হওয়ার পর দেখি শ্যামল ডাক্তারের দোকানে শোয়া। হাত একটা ভেঙে গেছে। কি যে যন্ত্রণা!"
-" স্যার, আপনি তো ছোটবেলায় ভালোই দুষ্ট ছিলেন।" -" কি দুষ্ট বেটা! মহা শয়তান ছিলাম হা হা হা। চট্টগ্রাম মেডিকেলে অপারেশান হয়েছিল। শমীরুল ইসলাম স্যার করেছিলেন। গোটাগোটা ছয় ইঞ্চি স্কার মার্ক! মেপে দেখতে পারিস।"
ফরিদ আঙুলের কড়া দিয়ে মেপে দেখল।
-* স্যার বরাবর ছয় ইঞ্চি!"
-* এতো অবাক হইসনা ব্যাটা। অর্থোপেডিক্সে যখন ইন্টার্ন করতে যাবি তখন এক বিঘত ইনসিশানও দেখবি।"
-"স্যার, অর্থোপেডিক্সে নাকি মিস্ত্রির মত কাজ করা লাগে।"
-"হুম। একেবারে আমাদের তাহের মিস্ত্রির মত। হাতুড়ি দিয়ে পেটাবি, ড্রিলমেশিন নিয়ে গর্ত করবি, নাটবল্টু লাগাই টাইড দিবি। রাজমিস্ত্রির মত প্লাস্টারও করবি। হুম!"

তিনটা উৎসাহী তরুণ একজন নিবেদিত শিক্ষকের কাছে গল্পেগল্পে আপার লিম্বের ব্লাড সাপ্লাই, নার্ভ সাপ্লাই, মাসলগুলোর কাজকারবার শিখে ফেলল।। ওদের চোখে অব্যক্ত কৃতজ্ঞতা। পড়াশোনা এত মজা হয় কেমনে! ফরিদ তো মোটামুটি শপথ নিয়েই ফেলেছে সে অর্থোপেডিক্সে ক্যারিয়ার করবে। পড়ানো শেষে স্যার গ্লাভস খুলতে খুলতে ওদের বললেন, যা পড়াইছি তোদের তিনজন থেকে কালকে আইটেম নিব। পড়ে আসবি। ক্যাডেভারটাকে সম্মানের সাথে কাপড় দিয়ে ঢেকে দে।"
-" স্যার, সম্মানের সাথে!" রোকন অবাক হয়ে যায়।
-" অবশ্যই! দেখ, ওনি একজন মানুষ। বেওয়ারিশ লাশগুলো এখানে একাডেমিক পারপাসে আনা হয়। কোন এক হাসপাতালে হয়তো ওনার মৃত্যু হয়েছে। হয়তো পরিবারহীন কোন
মানুষ! হতদরিদ্র! এতো দরিদ্র যে হাসপাতালে গিয়ে খোজ নেয়ার মত অবস্থাও ওনার পরিবারের নেই। হয়তো ওনার জন্য এখনো ওনার পরিবার অপেক্ষা করে আছে। ওদের প্রিয়জনকে আমরা এখানে কাটাকুটি করছি। জীবিত বা মৃত প্রতিটা মানুষ এই দুনিয়ায় মূল্যবান। বুঝলি? ইজ্জত দিবি ইজ্জত পাবি।"
স্যারকে ইমোশনাল হয়ে যেতে দেখে ওরা কাচুমাচু হয়ে গেলো। মাথা নেড়ে কেবল বলে' জ্বী স্যার।"
এভাবে দিন যায় মাস যায়। ছাত্রছাত্রীদের জন্য আজাদ স্যারের টাইম টেবিল নাই। স্যারের সময় থাকলে পোলাপাইন তাঁর কাছে যেকোনো পড়া বুঝিয়ে নিতে আসে। তাঁর দরজা ছাত্রদের জন্য সবসময় খোলা। ছাত্ররা অনুভব করছে একজন প্রকৃত শিক্ষক জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন। যে কোন একাডেমিক সমস্যায় তারা স্যারকে খুজে। আইটেম নিয়ে প্যারা কেউ নেয় না। ক্লাসের পড়া ক্লাসেই সত্তরভাগ পড়া শেষ। এনাটমির মত এত কটমটে সাবজেক্ট যে ওদের ভালো লেগে যাবে তারা ভাবতেই পারেনি। বিশেষ করে ফরিদ। সে মাঝারি মানের ছাত্র। আগে মেডিকেলে ঢোকার পর থেকেই এর ওর থেকে মেডিকেলের স্ট্রেসের জীবন নিয়ে নেগেটিভ কাউন্সেলিং এর যন্ত্রণায় পড়া মাথায় ঢুকত না। ইচ্ছে হত পালিয়ে যেতে। কিন্তু স্যারের উৎসাহে সে পড়াশোনায় মন দিতে পারছে এখন। এখন মনে হচ্ছে পড়াশোনা ব্যক্তিগত বিষয়। রুটিনমাফিক সময় দিলে সবই ঠিক হয়ে যায়। কার্ড টার্মগুলোও পাশ করে যাচ্ছে নিয়মিত। অন্যান্য সাবজেক্টগুলোতেও ভালো করছে সে। 'পড়াশোনা একটা নিয়মিত বিষয়, একটু একটু পড়বি কিন্তু নিয়মিত পড়া চাই। এক মাসের মধ্যে দেখবি অনেক পড়া হয়ে গেছে। কিন্তু ভুলেও একদিন পড়ে তিনদিন ঘুমানো যাবেনা। তাইলে এমনভাবে পিছাবি আর ট্র্যাকে আসতে পারবিনা।" স্যারের এ নির্দেশ সে অক্ষরে অক্ষরে মানে। প্রফ এসে শেষ হয়ে যায়। সবাই থার্ড ইয়ারে ওঠে যায়। সবাই মহাখুশি। প্রথমবারের মত ওয়ার্ডে ক্লাস করল ওরা। ওয়ার্ডের এ মাথা ও মাথা ওরা দৌড়াদৌড়ি করছে, প্যাশেন্ট থেকে হিস্ট্রি নিচ্ছে, ফাইল দেখছে সে এক এলাহী কারবার। খুবই মজা পাচ্ছে ওরা। ওয়ার্ডের এমও ভাইয়া আপুরা ওদের উদ্দীপনা দেখে মজা পাচ্ছে। কেউ কেউ অবশ্য বিরক্ত হচ্ছে মনে হল। একজন তো

বাঁকা করে বলেই বসল, "প্রথম প্রথম বহুত তেল থাকবে। দুদিন পর তেল সব বের হয়ে যাবে।" ফরিদ গা করেনা। মনিটর সে। সবাইকে বলে," আজাদ স্যার বলেছেন মেডিকেলে নেগেটিভ মানুষদের থেকে দূরে থাকতে। এরা হিংসুটে প্রকৃতির হয়। কেউ ভালো করুক ওরা চায়না। তাই ওদের কথায় এতো পাত্তা না দিয়ে যে যার কাজ করে যা..."

আজাদ স্যারের সাথে থার্ড ইয়ারের প্রথম দিনই ফরিদের দেখা। বিকেলে আসরের নামাজ পড়ে মসজিদের সামনে বসে আছেন। স্যারের মন খারাপ মনে হল। ফরিদকে দেখে স্যার বলে ওঠেন," কিরে ফরিদ, কেটজাং পড়ছিস?'

-"না স্যার শুরু করিনাই। মাত্রই তো থার্ড ইয়ারে ওঠলাম। আজকে প্রথমদিন।"

-" গাধা, প্রথমদিন কখন শেষদিন হয়ে যাবে টেরই পাবিনা। গায়ে হাওয়া লাগাইসনা বাপ। কেটজাং পড়া শুরু করে দে। না পড়লে ফার্মা আগামাথা কিছু বুঝবিনা। ফার্মা না বুঝলে ডেভিডসন বুঝবিনা। ডেভিডসন না বুঝলে জিন্দেগী পান্থাভাতের মত পানসে হয়ে যাবে। যতই ঘি ঢাল বিরিয়ানীর টেস্ট পাবিনা। থার্ড ইয়ারের টাইমটা কাজে লাগা। বুঝলি?"

সুবোধ বালকের মত ফরিদ মাথা নেড়ে বলে, "আচ্ছা স্যার।" কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে,'স্যার, আপনাকে উদাস উদাস লাগতেছে। আপনার কি মন খারাপ?"

-" আরে বলিস না ব্যাটা রেসিডেন্সি হয়নাই। ডাব্বা মারছি। এই জীবনে আর নিটোরে যাওয়া লাগবে না মনে হয়।"

-" স্যার, চিন্তা করবেননা নেক্সটবার হয়ে যাবে।"

-" নেক্সটবার হইতে হইতে বুড়ো হয়ে যাব। চুল কয়েকটা পেকে গেছে। পাস করতে করতে অর্ধেক পেকে যাবে। তখন এই বুড়োকে কে মেয়ে দিবে?"

বলতে বলতে স্যার হা হা হা অট্টহাসি দিয়ে ওঠলেন। ফরিদও হেসে ওঠে।

-"স্যার, আপনি এটা কোন কথা বললেন! আপনি বিয়ে করবেন শুনলে মানুষ রাস্তায় মাইক নিয়ে নেমে যাবে।"

-"ধুর! তুই এখনো দুধের শিশু। ওসব তুই বুঝবিনা। জীবন বহুত কঠিন! বুঝলি?" কিছুক্ষণ চুপ থেকে বসা অবস্থায় পা দুটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দেন আর হাত দুটো পেছনে ঘাসের উপর ঠেস দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলেন, ফ্রম ডাস্ট উই হ্যাভ কাম, ডাস্ট উই উইল বি। ফ্রম দ্যাট ডাস্ট উই উইল বি রেজারেক্টেড এগেইন। কিন্তু কিছু মানুষকে আল্লাহ অতিসাধারণ ডাস্ট দিয়ে বানান ফরিদ। দুনিয়ার জন্য তারা ঘাম, অশ্রু আর রক্ত দিয়ে তাজমহল বানালেও দুনিয়া সেটাকে বালির খেলাঘর মনে করে। আচ্ছা বাদ দে এসব উচ্চমার্গীয় কথামার্তা তুই বুঝবিনা। যা পড়তে বোস গিয়ে।"

স্যারের চেহারায় আবারো উদাসভাব চলে এল। ফরিদ বুঝতে পারেনা স্যার কি কারণে উদাস হয়ে গেলেন। বিয়ে না হওয়ার দুঃখে নাকি রেসিডেন্সি না হওয়ার দুঃখে। মনেমনে অপরাধবোধ এসে গেলো। স্যারের এমনিতেই রেসিডেন্সি না হওয়ার কষ্ট তার উপর এখন বিয়ে করতে না পারার কষ্টটাও এড করে দিল সে। স্যারের সাথে আরো কিছুক্ষণ কথা বলে ফরিদ হোস্টেলের দিকে হাটা দেয়। পড়তে বসতে হবে কালকে ফরেনসিকের প্রথম আইটেম। একটা ডেফিনেশানও ভুল করা নিষেধ। ভুল করলে ফরহাদ স্যার পিঠের ছাল তুলে ফেলবেন। বাপ রে যে কঠিন মাস্টার! প্রথম দিনই যে লেভেলের ধমকালেন, ফরিদের তো গলা শুকিয়ে কাঠ। হাটতে হাটতে ফরিদ পিছন ফিরে দেখে আজাদ স্যার উদাসমুখে মসজিদের সামনের পাহাড়ী ছড়ার দিকে তাকিয়ে আছেন। ফরিদের হঠাৎ স্যারের জন্য মায়া লেগে ওঠে। শুধু ওর কাছে না সব স্টুডেন্টের কাছেই স্যারের সারল্য অসম্ভব ভালো লাগে। কেমন যেন একটা মায়াবী দুঃখী দুঃখী ভাব চেহারায়। দিন আসে দিন যায়। ফরিদরা এ ইয়ার ও ইয়ার করে করে পাস করে বের হয়ে যায়। ওরা থার্ড ইয়ারে থাকতেই আজাদ স্যারের বদলি হয়ে যায়। বহুদিন স্যারের সাথে কথা হয়না।

স্যারের চেহারায় আবারো উদাসভাব চলে এল। ফরিদ বুঝতে পারেনা স্যার কি কারণে উদাস হয়ে গেলেন। বিয়ে না হওয়ার দুঃখে নাকি রেসিডেন্সি না হওয়ার দুঃখে। মনেমনে অপরাধবোধ এসে গেলো। স্যারের এমনিতেই রেসিডেন্সি না হওয়ার কষ্ট তার উপর এখন বিয়ে করতে না পারার কষ্টটাও এড করে দিল সে। স্যারের সাথে আরো কিছুক্ষণ কথা বলে ফরিদ হোস্টেলের দিকে হাটা দেয়। পড়তে বসতে হবে কালকে ফরেনসিকের প্রথম আইটেম। একটা ডেফিনেশানও ভুল করা নিষেধ। ভুল করলে ফরহাদ স্যার পিঠের ছাল তুলে ফেলবেন। বাপ রে যে কঠিন মাস্টার! প্রথম দিনই যে লেভেলের ধমকালেন, ফরিদের তো গলা শুকিয়ে কাঠ। হাটতে হাটতে ফরিদ পিছন ফিরে দেখে আজাদ স্যার উদাসমুখে মসজিদের সামনের পাহাড়ী ছড়ার দিকে তাকিয়ে আছেন। ফরিদের হঠাৎ স্যারের জন্য মায়া লেগে ওঠে। শুধু ওর কাছে না সব স্টুডেন্টের কাছেই স্যারের সারল্য অসম্ভব ভালো লাগে। কেমন যেন একটা মায়াবী দুঃখী দুঃখী ভাব চেহারায়। দিন আসে দিন যায়। ফরিদরা এ ইয়ার ও ইয়ার করে করে পাস করে বের হয়ে যায়। ওরা থার্ড ইয়ারে থাকতেই আজাদ স্যারের বদলি হয়ে যায়। বহুদিন স্যারের সাথে কথা হয়না।

ইন্টার্নশীপে ফরিদের প্রথম প্লেসমেন্ট হল মেডিসিনে। খুবই রাশ, ইমারজেন্সী রোগীর প্রেশার, আধামরা রোগী সব। ফরিদরা যারা নতুন জয়েন দিয়েছে খুবই ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। তবে সময় পেলে সে ইমারজেন্সীতেও ঘোরাঘুরি করে। ইমারজেন্সী কেস হ্যান্ডেলিং সে শিখতে চায়। আজাদ স্যার বলতেন,' দুনিয়ায় থিওরিটিকাল বিষয়ের চেয়ে প্র্যাকটিকাল বিষয় বেশি। ইন্টার্নশীপে সময় পেলে ইমারজেন্সীতে ঢু মারবি। দেখবি কতভাবে প্যাশেন্ট হ্যান্ডেল করা হয়।" সেই বোধ থেকে ইমারজেন্সীতে আসা। ইএমওরা প্রচুর ব্যস্ত থাকেন। তবুও ফরিদ ওনাদের সাথে ভাব জমানোর চেষ্টা করে। ইএমওদের মধ্যে শামীম ভাইয়ের সাথে বেশ ভাব জমে গেলো তার। ইমারজেন্সী ম্যানেজমেন্ট একটা আর্ট। শামীম ভাইয়ের হাতের কাজ দেখে তার কাছে এটাই মনে হয়।

-"দেখি ফরিদ, নিডল হোল্ডার নে।"
ফরিদ নিডল হোল্ডার ডানহাতে নিয়ে শামীম ভাইকে দিতে গেলো। তিনি ফরিদকে থামিয়ে দিয়ে বলেন," দেখা তো দেখি কিভাবে ধরিস।" ফরিদ কায়দা করে বুড়োআঙ্গুল আর মধ্যমা দিয়ে নিডল হোল্ডার ধরল। তার নিডল হোল্ডার ধরা দেখে শামীম ভাই হো হো করে হেসে ওঠলেন। কৌতুককণ্ঠে বলেন, 'ডামিশ, এটা তুই তোর ইয়ে কাটার কাঁচি পেয়েছিস? এই দেখ আমি কিভাবে ধরি।' বলে তিনি নিডল হোল্ডার নিয়ে দেখিয়ে দিলেন। "তর্জনী আর মধ্যমা দিয়ে হোল্ড করবিনা, হোল্ড করবি বুড়ো আঙ্গুল আর অনামিকা দিয়ে। তর্জনী আর মধ্যমা দিয়ে সাপোর্ট দিবি, বুঝলি? নে শুরু কর। সুতা নে।' ফরিদ প্রোলিনের প্যাকেট খুলে হোল্ডারের মাথায় নিতেই হিমশিম খেয়ে গেলো। শামীম ভাই হতাশ ভঙ্গিতে বললেন," দে আমাকে দে।" হোল্ডারের মাথায় সুতা নিয়ে ফরিদকে বললেন, 'স্টিচ দে।" ফরিদ হঠাৎ আকাশ থেকে পড়ল। সে ভাবতে পারেনি স্টিচ দেয়ার সুযোগ পাবে। বলে, আমাকে বলছেন ভাই? স্টিচ
দিব?"
-"হ্যা তোরেই তো বলছি। আর কোন মানুষ তো দেখিনা আশেপাশে। তুই কোন জ্বীন-হুর-পরী দেখছিস নাকি?"
-'ভাই আগে কখনো দেইনাই। পারিনা।"
-* তুই দে। আমি বলতেছি কেমনে দিবি।"
ফরিদ শামীম ভাইয়ের কথা মতো শুরু করলো। তার হাত কাঁপতেছে। জিনিসটা সে যত সহজ মনে করেছে অত সহজ না। ওটিতে সার্জারীর স্যারদের দ্রুত কাজ করা দেখে পান্তাভাত মনে হলেও নিজে করা বহুত কঠিন। শামীম ভাই বললেন," আচ্ছা আমাকে দে। তুই দেখ। নেক্সটটা তোরে করতে হবে। বুঝলি?" ফরিদের মন খারাপ হয়ে গেলো। ব্যাড পারফর্মেন্স!
শামীম ভাই ফরিদের মন খারাপ হয়েছে বুঝতে পারলেন। বাইট দিতে দিতে ফরিদকে জিজ্ঞেস করলেন
-'মন খারাপ?"
-"না ভাই।"
-* সাতার জানিস?"
-"হ্যা ভাই।"
-" সাতার শেখার আগে কয়বার পুকুরের মাম খেয়েছিস?"। ফরিদ হেসে ফেলল।' কবার খাইছি মনে নাই ভাই। তবে অনেকবার খাইছি।"
-" পুকুরের পানির টেস্টটা খুবই পিকিওলিয়ার না?"
-" হ্যা ভাই। কেমন যেন একটা সোঁদা ঘ্রাণ। আমি স্টিল ভুলতে পারিনা।' ফরিদ একটু সহজ হয়ে ওঠল।
-" সাতার শিখতে গিয়ে পানি খাবি আর জীবন্ত মানুষের গায়ে স্টিচ দিতে তোর হাত কাঁপবেনা ওটা হতে পারেনা। হাত কাঁপাকাঁপি করবেই। ও কিছুনা। একসময় ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। মন খারাপ করিসনা। আমাদের মোখলেস স্যারের হাতও তোর বয়সে কাঁপত। ওনি এখন দেখ লিজেন্ড! পেটে হাত দিয়েই বুঝে ফেলেন এপেন্ডিকস কোথায়, পেটে ঢোকা লাগেনা। কাঁপাকাঁপি না করে কাটাছেড়া করতে পারলে তুই তো মানুষ থাকতিনা ফরিশতা হয়ে যাইতি।"
-" ভাই, ফেরেশতা কি ওটি করে!'
ফরিদের বাচ্চাসুলভ প্রশ্নে শামীম ভাই হেসে ফেললেন। নট দিতে দিতে বলেন," কি বলিস! ওটি করে মানে! একেবারে কার্ডিয়াক সার্জারী পর্যন্ত করে ফেলে।' ফরিদ পাজল্ড হয়ে গেলো। বলে, কি বলেন ভাই!"
-" রাসুল স. এর কাহিনী জানিসনা? ওই যে ছোট থাকতে দুজন ফেরেশতা ওনার বুক ফেঁড়ে ক্বলব বের করে ধুয়ে ফেলেছিলেন। তারপর আবার জোড়া লাগিয়ে দিয়েছিলেন। ওইটা তো
ব্যাটা কার্ডিয়াক সার্জারীই।"
আসলেই তো! ফরিদ অবাক হয়ে যায়। এই সহজ বিষয়টা সে এতদিন ভেবে দেখিনি। ঘটনাটা জানি ভাই। কিন্তু এভাবে তো ভেবে দেখিনি"
-" ভাবতে হবে ব্যাটা। ইসলামে সবই আছে। আমাদের অন্তর্দৃষ্টির অভাবে আমরা রহস্য বের করতে পারিনা।"
এভাবে গল্পেগল্পে সে স্টিচ দেয়া শিখে ফেলে। নটের কারিকুরি যে কত প্রকার! সে হয়রান হয়ে যায়। বেইলি লাভ পড়ার সময় এসব আগামাথা কিছুই বুঝে নাই। প্র্যাকটিকাল আর থিওরিটিকাল পড়া এক না। শামীম ভাইকে ফরিদের অসম্ভব ভালো লেগে যায়। হঠাৎ আজাদ স্যারের কথা মনে পড়ে গেলো তার। শামীম ভাইয়ের সাথে স্যারের অনেক মিল। ভাইয়ের মধ্যে সে স্যারকে দেখতে পেলো। দুজনেই একেবারে ইনবর্ন গুরু। পড়া মাথায় ঢুকিয়ে দিতে ওস্তাদ। স্যার এখন কোথায় কে জানে? শেষবার কুমিল্লা মেডিকেলে ছিলেন শুনেছিল সে।
সময় পেলেই ফরিদ ইমারজেন্সীতে ঢু মারে। বিশেষকরে শামীম ভাই থাকলে। সবসময় ওনি সময় দিতে পারেননা। ইমারজেন্সীতে সবসময় রাশ লেগে থাকে। মাঝেমাঝে মারামারি পর্যন্ত লেগে যায়! তবুও সময় পেলে ওনি ফরিদকে শেখান। গল্পেগল্পে ওনার কাছ থেকে সে বিভিন্ন অতিপ্রয়োজনীয় টুকটাক কাজ শিখে ফেলেছে। ছোটখাট স্টিচ দেয়া, ড্রেসিং করা, প্লাস্টার করা, ক্যাথেটার করা, এনজি করা ইত্যাদি কাজগুলোতে সে সার্জারী-গাইনীতে যাওয়ার আগেই দক্ষতার সাথে শিখে ফেলেছে। রোজকার মতই একদিন ইমারজেন্সীতে গিয়ে দেখে শামীম ভাই চিন্তিত মুখে বসে আছেন। ফরিদকে খেয়াল করলেননা।
-" ভাই, কেমন আছেন?"
না তাকিয়েই তিনি আনমনে বললেন, "হুঁ"
-"ভাই, চিন্তিত?"
-'হুঁ' আবারো আনমনে উত্তর।
-"ভাই, চিপস খাবেন? ইনসেপটা আজকে ভিজিটে চিপস দিছে। চিপসের উপর গোটাগোটা হরফে লেখা ইমিক্সেফ৪০০। চিপস খাওয়ার সময় মনে হচ্ছে সাথে সাথে পেটে ইমিক্সেফও চলে যাচ্ছে! কি দিন আইল রে বাপ!"
-"হুঁ" টেবিলের উপর একটা ইমারজেন্সী টিকেটের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবারো আনমনে উত্তর দিলেন তিনি। ওনার চেহারায় কোন ভাবান্তর নেই। মনে হয়না ফরিদের জোক শুনেছেন। বোঝা যাচ্ছে শামীম ভাই এই জগতে

নাই। ফরিদ আর রোকন একজন আরেকজনের দিকে তাকায়। ফরিদ গলা চড়িয়ে বলে, "ভাই, অ ভাই, বসব?"
হঠাৎ ধাতস্থ হয়ে ওঠেন শামীম ভাই। বলেন,'ও ফরিদ! তুই! বোস। ভালই হল তোরা এসেছিস। মন-দিল ভালো নেই আজকে।"
-"আপনার মন যে ভালো নেই তা আমরা বুঝতেছি। অনেকক্ষণ আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করতেছি। কোন সমস্যা ভাই?" চেয়ার টেনে বসতে বসতে কৌতুহলী ফরিদ শুধায়। শূণ্যদৃষ্টিতে ফরিদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আনমনে শামীম ভাই স্বগতোক্তি করলেন," আমিও কোন একটা হসপিটাল ইমারজেন্সীতে এভাবে মরে পড়ে থাকব হয়তো। সাথে মা-বাবা, বউ বাচ্চা কেউ থাকবেনা।" ফরিদ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। বলল, "ভাই, কার কথা বলছেন?"
-"ব্রট ডেড একটা পেশেন্ট এসেছে। খুব বাজে ভাবে এক্সিডেন্ট করেছে। চেহারা সুরত চেনা যাচ্ছেনা। খুব সম্ভবত হাইওয়েতে মাথার উপর দিয়ে ট্রাকের চাকা চলে গেছে। আশেপাশের লোকজন ধরাধরি করে নিয়ে এসেছে। মারা যাওয়ায় ওরাও চলে গেছে। কি করব বুঝতে পারছিনা। পুলিশ ডেকেছি। ওরা আসতেছে।"
-"কি বলেন ভাই ভেরি স্যাড নিউজ" একটু ভেবে ফরিদ বলে' কত মৃত্যু দেখছেন ভাই! কখনো তো আপসেট দেখিনাই আপনাকে এতো।"
-"লোকটাকে অবস্থাপন্ন শরীফ লোক মনে হচ্ছে। আমাদের বয়সী হবেন মনে হয়। দেখে কেন যেন পরিচিত পরিচিত ভাব। এজন্যই হয়তো। তাছাড়া সাথে কেউই নেই।"
-"এখন কোথায় রাখছেন ওনারে?"
কিছুদূরে ট্রলী দেখিয়ে বললেন, ব্রট ডেড তো। ট্রলী থেকে আর নামাই নি। ওখানে আছে।'
-"পরিচয় পেয়েছেন ভাই?"
-"নাহ! ফোন মানিব্যাগ কোনকিছু নাই'
-" হয় রাস্তায় পড়ে গেছে অথবা কেউ চুরি করেছে। বাঙ্গালি জাতিরে বিশ্বাস করা যায়না।" নিজের জাতির নানা কাজকর্ম নিয়ে হতাশ রোকনের নির্ভেজাল কমেন্ট।
-" ব্যাটা, নেগেটিভ মন্তব্য করবিনা। পজিটিভ বিষয়ও আছে। তাকে কিছু মানুষ পকেটের পয়সা খরচ করে দশমাইল দূর থেকে একেবারে নিঃস্বার্থে এখানে নিয়ে এসেছে। মরে গেছে
জেনেও। ইউরোপ আমেরিকা হলে কেউ ছুঁয়েও দেখতো না ডরে।"
-" ঠিক বলেছেন ভাই।" কিছুক্ষণ চুপ থেকে রোকন বলে, হদিস চেয়ে ফেসবুকে দিয়ে দেন নাইলে।"
-" চেহারাই তো বিকৃত হয়ে গেছে। ফেসবুকে দিয়ে কি লাভ? জুকারবার্গ ভায়োলেন্সের নাম দিয়ে আমার আইডি খাইয়া দিবে।" এ অবস্থায়ও শামীম ভাইয়ের স্বভাবজাত রসবোধ জেগে ওঠল।" পরিচয় বের করতে পুলিশের অবশ্য সময় লাগবেনা।" পুলিশের কথা বলতে বলতেই শামীম ভাই কি যেন ভেবে বলে ওঠলেন, জানিস? লোকটার হিউমেরাসে ফ্র্যাকচার ছিল আগে।"
-" তাই নাকি! কিভাবে বুঝলেন?"
-"সার্জিকাল স্কারমার্ক আছে।"
-"কোন আর্মে?"
-" লেফট। পালপেট করে দেখেছি প্লেট বসানো নাই। তারমানে অনেকআগের ফ্র্যাকচার হিস্ট্রি।"
-"বয়স কেমন?"
-"হাইয়েস্ট থার্টি ফাইভ।"
-"টিশার্ট পড়া পেছনে লেখা- ওয়ার্ল্ড থ্যালাসেমিয়া ডে, ৮ ই মে। কোন ডাক্তার কিনা কে জানে? অবশ্য এরকম টিশার্ট ডাক্তার-অডাক্তার অনেকেই পড়তে পারে।"
ফরিদ ঝট করে রোকনের দিকে তাকালো।
-"ভাই, আমরা একটু দেখতে পারি ওনাকে?"
"দেখ।" একটু চুপ থেকে শামীম ভাই বললেন,' লেফট লিটল ফিঙ্গারের মিডিয়াল এসপেক্টেও একটা স্কারমার্ক আছে। ওটা দেখে আমাকে বলিস ওটা ওল্ড না নিউ ইনজুরি। আসছিস যখন একটু কোলাজেন টিস্যু নিয়ে পড়াব তোদের। লেফট আর্মের স্কারটাও দেখিস।"
রোকন কি যেন মনে করার চেষ্টা করতেছে। ফরিদের চোখের দিকে ভয়মেশানো, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার হাত চেপে ধরল। কাঁপাকাঁপা গম্ভীর গলায় বলল,' ফরিদ, মনে আছে তিনি গল্প করেছিলেন ছোটবেলায় গরুর জন্য ঘাস কাটতে গিয়ে কাঁচিতে কেটে গিয়েছিলেন। লেফট লিটল ফিঙ্গারের মিডিয়াল এসপেক্টের ইয়া বড় স্কারমার্কটা আমরা ধরে দেখেছিলাম।" শুনেই ফরিদ ঝট করে রোকনের দিকে তাকায়। জগতের সমস্ত শঙ্কা, ভয় তার চোখে এসে হাজির হল। ওকে দেখে মনে হল তার হঠাৎ কোন কিছু মনে পড়ে গেছে। শামীম ভাই ওদের চেহারার হঠাৎ পরিবর্তনের কারণ ধরতে পারলেননা। কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করেন,' তোরা কি বিষয়ে কথা বলছিস?" শামীম ভাইয়ের কথা শেষ হওয়ার আগেই ওরা দৌড়ে ছুটে যায় ট্রলির দিকে। পেছন পেছন হতভম্ব শামীম ভাইও ছুটেন। ওরা কাপড় ওঠিয়ে চেহারা দেখে আগে। বিকৃত থেতলানো চেহারা চেনা যায়না শুধু ঝকঝকে দাড়িগুলো বুঝা যাচ্ছে। রক্তে লেপ্টে আছে। ফরিদের চোখে পানি চলে এলো। ঝাপসা চোখে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মৃতের চেহারার দিকে তাকিয়ে রইল। রোকন পাগলের মতো দ্রুত লেফট আর্মের স্কারমার্ক দেখল। বিড়বিড় করে বলল," গোটা গোটা ছয় ইঞ্চি স্কারমার্ক।"
-* লিটল ফিঙ্গারের স্কারমার্কটা দেখ।"
-* সেই একই স্কারমার্ক, ফরিদ।'
কাঁপাকাঁপা হাতে ফরিদ বামহাতটি তার হাতের মুঠোয় তুলে নিল। ঠান্ডা হাত। রিং ফিঙ্গারে একটা মেটালিক রিং পড়া। রিংটা দেখেই সে চিনে ফেলল। দেখে হু হু করে সে কেঁদে ফেলল সে। পাঁচবছর আগের কোন এক কনভার্সেশান তার মনে পড়ে গেলো।
-" স্যার, এরকম পীর ফকিরি রিংয়ে বিশ্বাস করেন আপনি? পরিষ্কার কুসংস্কার এগুলো।"

-* এসব আমি বিশ্বাস করিনা ফরিদ। কিন্তু আমি পড়ি অন্যকারণে। এটা আমার মায়ের দেয়া। অনেক কুসংস্কার আছে ওনাদের। গ্রামের অতিসাধারণ মহিলা তিনি। অতিসাধারণ মানুষের অতিসাধারণ এই রিং আমার কাছে এখন অতিঅসাধারণ। তাই আমি এটা পড়ি। আমার শরীরে আমার মায়ের স্পর্শধন্য এই শেষচিহ্ন রাখায় কোন ত্রুটি দেখিনা।" জীবন্ত অবস্থায় এই হাতকে স্পর্শ করার সাহস হয়নি তার। আজ সেই হাতকে হাতের মুঠোয় নিয়ে হঠাৎ হু হু করে কেঁদে ফেলল ফরিদ। অস্পষ্ট গলায় ফুঁপিয়ে, গোঙানোর মত করে স্বগতোক্তি করল," স্যার..."

শামীম ভাই হতভম্বের মত দাড়িয়ে আছেন। ফরিদের কাঁধে সান্ত্বনা-স্নেহের হাত রেখে রোকনকে জিজ্ঞেস করেন,

-" ওনি তোদের পরিচিত, রোকন?"

-" ওনি আমাদের স্যার... রোকনের শুকনো গলা মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেলো। শুনতে ফ্যাকাশে মনে হল।

শামীম ভাইয়ের চোখ বড়বড় হয়ে গেলো। কাঁপাকাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন,

-"কোন স্যার?"

-" আজাদ স্যার

-"তোদের লিজেন্ড আজাদ স্যার?"

অসহায়ের মত রোকন মাথা নাড়ে।

-"আপনি চিনতেন ভাই?"

-'সামনাসামনি দেখিনি। তবে আগের ইন্টার্নদের থেকে ওনার গল্প শুনেছি অনেক।"

শামীম ভাই বজ্রাহত মূর্তির মত দাড়িয়ে রইলেন। এজন্যই হয়তো খুবই চেনাচেনা মনে হচ্ছিল ওনাকে। অনেক মৃত্যু দেখলেও এ মৃত্যুতে উনি শুরু থেকেই কেন যেন খুবই হতাশ আর অসহায় অনুভব করছিলেন। বিপর্যয়ের আগেপরের সময়গুলোতে আশেপাশের মানুষদের মধ্যে একটা সাইকোলজিকাল অস্থিরতা কাজ করে। এটার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু এটা অতিসত্য ব্যাপার। হাসপাতালের নির্জন করিডোরে একটা অতিসাধারণ ট্রলিতে একজন আত্নীয়স্বজনহীন, পরিবারহীন মৃতমানুষ শুয়ে আছেন। তাঁকে ঘিরে তিনজন লোক দাড়িয়ে আছে। তারা কেউই তাঁর রক্তের সম্পর্কের না। কিন্তু আত্নার আত্নীয়। আত্মার আত্নীয় থাকলে আর কি লাগে! তাদের চোখে অশ্রুর ঝড়। এভাবেই কি একজন সম্ভাবনাময় মানুষ-তাদেরই কাছের একজন অতিপ্রিয়জন হুট করে শেষ হয়ে যাবে। কোনভাবেই তারা মানতে পারছেনা। কোনভাবেই না। ফরিদের কানে শুধু অনুরণন হয়ে যায় স্যারের একটা কথা, " ফ্রম ডাস্ট উই হ্যাভ কাম, ডাস্ট উই উইল বি, ফ্রম দ্যাট ডাস্ট উই উইল বি রেজারেক্টেড এগেইন। কিছু মানুষকে আল্লাহ অতিসাধারণ ডাস্ট দিয়ে বানান ফরিদ। দুনিয়ার জন্য তারা ঘাম, অশ্রু আর রক্ত দিয়ে তাজমহল বানালেও দুনিয়া সেটাকে বালির খেলাঘর মনে করে...' হাসপাতাল মসজিদ থেকে কেঁপেকেঁপে এশার আজান আসছে। ভয়ংকর করুণ সুর।। ফরিদের অন্তর মোচড় দিয়ে ওঠে।

অনেকদিন পর। সিএমসির ডিসেকশান হল। লাস্ট গ্রুপের আইটেম চলছে।

-" এই বল রেডিয়াল নার্ভের কোর্স ডিস্ট্রিবিউশান কি?"

-" স্যার পারিনা"

-" কেন?"

-" স্যার, ডিসেকশান ভাল মতো দেখতে পারিনি।" স্যার পূর্ণদৃষ্টিতে জালালের দিকে তাকালেন। উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন দেখতে পারিস নি?"

-"স্যার মেয়েরা আমাকে ঠেলে পিছনে ফেলে দেয়। মোটা হওয়ায় আমার জন্য নাকি দেখেনা ওরা।"

অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরা হো হো করে হেসে দিল। স্যার হাসলেন না। তাঁর চেহারায় কেমন যেন একটা দুঃখ অনুভূতি দেখা গেল।

-" এই থাম তোরা। আর কে কে দেখতে পারিস নি?" পাঁচ ছয়জন হাত তুলল। আচ্ছা, আজ মাগরিবের পর তোরা ডিসেকশান হলে প্রেজেন্ট থাকবি। তোদের ডিসেকশান দেখাব নে। আর হ্যা গ্লাভস নিয়ে আসবি।"

বলেই কারো দিকে না তাকিয়ে তাদের ফরিদ স্যার হলরুম থেকে বের হয়ে গেলেন। চুপচাপ করিডোর ধরে হেটে ক্যাফেটেরিয়ার দিকে যেতে লাগলেন। করিডোরকে তাঁর ঝাপসা মনে হল। কেউ না দেখে মতো অতিসন্তর্পণে তিনি অশ্রু মুছে ফেললেন। বুকের মধ্যে হঠাৎ ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। গলাও কেমন যেন ধরে এসেছে। একটা কড়া লিকারের চা খেতে হবে।

জুলাইয়ের স্মৃতি কথা

- ডাঃ মুহাম্মদ
লেকচারার (মাইক্রোবায়োলজি), চট্টগ্রাম ইন্টারন্যশনাল মেডিকেল কলেজ

জুলাই এক ভয়ানক ও তরুণ মনে বারুদের আগুন জ্বালানো আন্দোলনের নাম। যে জুলাই আন্দোলন এদেশের ছাত্রজনতার অসীম সাহসিকতা ও ত্যাগের বিনিময়ে এবং মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে সাফল্যের মুখ দেখেছে। যে জুলাই সফল না হলে বাংলাদেশের ভাগ্যাকাশে অন্য এক ইতিহাস লেখা হতো, যেখানে স্বৈরাচারী হাসিনা বিজিত এবং পরাজিত পক্ষ থাকতো জুলাই আন্দোলনের যোদ্ধারা এবং সারাদেশের সাধারণ মানুষ। আল্লাহর বিশেষ সহায়তায় বাংলার ইতিহাসের এক নিকৃষ্টতম স্বৈরশাসক খুনি হাসিনার পতনের মাধ্যমে ইতিহাস আজ জুলাই আন্দোলনের পক্ষে। খুনি হাসিনার দুঃশাসন থেকে মুক্তির এই জুলাই আন্দোলনে দেশ প্রেমিক মানুষের যে ত্যাগ তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। জুলাই আন্দোলন সফল হয়েছে এজন্য আল্লাহর কাছে হাজারো শুকরিয়া। আলহামদুলিল্লাহ

জুলাই আন্দোলনে আমার সম্পৃক্ততা নিয়ে কিছু স্মৃতি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। ১৬ তারিখের আগ পর্যন্ত আমার সম্পৃক্ততা ছিল না, তবে দেশের তৎকালিন পরিস্থিতির সার্বক্ষণিক খবরা খবর রাখতাম।

*১৬ জুলাই

১৬ তারিখ জুলাই আন্দোলনের চট্টগ্রামের মাস্টারমাইন্ড আবরার হাসান রিয়াদ ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ হয়। উনি আমাকে জানান যে বিকাল ৩ টায় ষোলশহর রেলস্টেশনে কর্মসূচি আছে সেখানে শৃঙ্খলা কমিটিতে লোক লাগবে। আমি আমাদের ক্যাম্পাসের আন্দোলন কেন্দ্রিক সক্রিয় কয়েকজন জুনিয়রকে ফোন করে জানিয়ে দেয় এবং কর্মসূচিতে পৌঁছে আবরার ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে বলি। যদিও আমার ইন্টার্নশীপ কেন্দ্রিক ব্যস্ততার কারণে ঐদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত হতে পারিনি। ঐদিন আওয়ামী সন্ত্রাসী ও পুলিশলীগের গুলিতে চট্টগ্রামের ৩জন বীর সন্তান শাহাদাত বরণ করেন (শহীদ ফয়সাল আহমেদ শান্ত, শহীদ ওয়াসিম আকরাম, শহীদ ফারুক)। আল্লাহ আমার ভাইদের শাহাদাত কবুল করে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুক। আমীন।

১৭ জুলাই

১৬ জুলাই চট্টগ্রামের ৩জন সহ সারাদেশের শহীদদের জন্য গায়েবানা জানাজার স্থান নির্ধারণ করা হয়েছিল লাল দীঘি ময়দানে বিকাল ৪টায়। ঐদিনও আবরার রিয়াদ ভাইয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী শৃঙ্খলা কমিটিতে প্রায় ১০ জনের অধিক সক্রিয় জুনিয়র এবং সহপাঠি নিয়ে লালদিঘী ময়দানে পৌঁছায়। সেদিন ছাত্রলীগ ও পুলিশলীগের হামলা ঠেকাতে আমরা প্রায় ৫০০ জন শিক্ষার্থী ৩ভাগে বিভক্ত হয়ে জেল রোড, কোতোয়ালি মোড় ও লালদিঘী মসজিদকে কেন্দ্র করে শৃঙ্খলা কমিটির দায়িত্ব পালন করি। এদিকে জানাযায় হাজার হাজার মানুষের স্বতঃপূর্ত অংশগ্রহণ এবং জানাযা শেষে বিশাল মিছিল নিয়ে আন্দরকিল্লা মোড়ে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে সেদিনের কর্মসূচি সুন্দরভাবে সমাপ্ত হয়েছিল।

১৮ জুলাই-

১৮ জুলাই কমপ্লিট শাট ডাউন ঘোষণা করে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন। ১৮ জুলাই ছাত্রদের আন্দোলন গণমানুষের

আন্দোলনে রূপ নেয়। কর্মসূচির আলোকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার প্রবেশপথ নতুন ব্রীজ এলাকায় ছাত্ররা অবস্থান নেয়। যথারীতি আমি এবং কয়েকজন জুনিয়র ও সহপাঠিসহ আমরা প্রায় ৪০০ জন শিক্ষার্থী শৃঙ্খলা কমিটিতে দায়িত্ব পালন করি। সেখানে আগে থেকেই ছাত্রলীগ ও পুলিশলীগ অবস্থান করে। প্রায় ঘন্টাখানেক স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত করে কর্মসূচী চলছিল। যেইমাত্র ছাত্ররা মিছিল নিয়ে সামনে আগানোর চেষ্টা করেছিল সাথে সাথে পুলিশলীগ ও ছাত্রলীগ অতর্কিত হামলা শুরু করে। টিয়ারশেল ও রাবার বুলেট সামনে আমরা প্রায় ১/২ ঘন্টা টিকে থেকে পাল্টা আক্রমণের (পাথর ছুড়ে) চেষ্টা চালিয়ে যায়। এরমধ্যে আমাদের কয়েকজন শিক্ষার্থী ভাই অজ্ঞান হয়ে যায় এবং পুলিশলীগ ও ছাত্রলীগ হামলা চালাতে চালাতে সামনে আগাতে থাকে, আমরা সাধারণ ছাত্ররা টিকে থাকতে না পেরে এদিক ওদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আর বেশিরভাগ শিক্ষার্থী মিছিলের সহিত বহদ্দারহাট জমায়েত হয়।

সেদিন আমার ইন্টার্ণশীপের বৈকালিক ডিউটি থাকায় বহদ্দারহাটে অবস্থান না নিয়ে চলে আসতে হয়। কিন্তু সেদিন বহদ্দারহাট কেন্দ্রিক পুলিশলীগের বর্বরোচিত হামলার ৪ জন ভাই শহীদ হন। এইদিন সারা বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেট ও ব্রডব্যান্ড সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হয়। সেদিন বহদ্দারহাট থেকে অসংখ্য আহত-গুলিবিদ্ধ ভাই আমাদের চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেলে চিকিৎসা নিতে আসে এবং আমরা ও মেডিকেল কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ বিনা খরচে চিকিৎসা দেয়া থেকে নিয়ে আহত ভাইদের নিরাপদে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নেয়। ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়ে ফ্যাসিস্ট সরকার দেশের মানুষের ওপর অমানবিক নির্যাতন চাপিয়ে দেয়। এমতাবস্থার আন্দোলন অনেকটা থমকে যাবে বলে সবাই ধারণা করতেছিল। কিন্তু আমরা (জুলাই আন্দোলনকারী সবাই) দমে যাওয়ার পাত্র নই। যথারীতি চট্টগ্রাম আন্দোলনের মাস্টার-মাইন্ড আবরার রিয়াদ ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে আন্দোলনের আপডেট নিই।

"১৯-২০ জুলাই-

১৯ তারিখ সকালবেলা ফোনে আবরার ভাইয়ের কাছ থেকে আন্দোলনের কর্মসূচি সম্পর্কে অবগত হয়। যথারীতি শৃঙ্খলা কমিটিতে লোকবল নিয়ে এবং ক্যাম্পাস কেন্দ্রিক অন্যান্য ছাত্র ভাইরা সহ আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদে জুমার নামাজ শেষে হাজার হাজার ছাত্রজনতার মিছিল লালদিঘী ময়দানে সমবেত হয়। সেখানে শান্তিপূর্ণ গায়েবানা জানাযা (বহদ্দারহাটের ৪জন শহীদ ভাইসহ সারাদেশের শহীদদের জন্য) শেষে মিছিল নিউমার্কেট, লাভলেইন হয়ে কাজির দেউড়ি আসলে পুলিশের সংঘর্ষ শুরু হয়। ১৯ তারিখ মধ্যরাত থেকে কারফিউ জারি করা হয়। ২০ জুলাই কারফিউ বলবৎ এবং ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় জনজীবন স্থবির হয়ে পড়ে। তাই এদিন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কোন কর্মসূচি ছিল না।

২১ জুলাই

যথারীতি কারফিউ বলবৎ ও ইন্টারনেট বন্ধ ছিল। তবে চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম কারফিউ ভেঙ্গে প্রবর্তক মোড়ে মিছিল শুরু হয়। এটা ছিল ২৪ এর ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম ঘটনা।

*২২ জুলাই

ইন্টারনেট বন্ধ ও কারফিউ বলবৎ ছিল। ঐদিন বৈ বিছা আ এর কোন কর্মসূচি না থাকলেও আবরার ভাইয়ের মাধ্যমে জানতে পারলাম কারফিউ ভেঙে ৩ জায়গায় মিছিল করার সিদ্ধান্ত হয়। তবে সেনা-বাহিনীর কঠোর অবস্থানের কারণে মিছিল করা সম্ভব হয়নি।

"২৩-২৮ জুলাই-

এই সময়ে চট্টগ্রামে সবধরনের কর্মসূচি বন্ধ ছিল। ২৮ তারিখ ডিবি হেফাযতে থাকা ৬ সমন্বয়ক আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়। সমন্বয়কদের জিম্মি করে ও নির্যাতন করে জোরপূর্বক বিবৃতি আদায়ের প্রতিবাদে পরদিন ২৯ জুলাই আবারো রাজপথ উত্তাল করার ঘোষণা আসে। তখন দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা দেয় যে, ২১ তারিখের উত্থাপিত ৯ দফা দাবি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত এ আন্দোলন চলবে।

*২৯ জুলাই-

জামালখান প্রেসক্লাব চত্ত্বরে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত হয়। তবে আগে থেকে সেখানে প্রশাসানের কঠোর অবস্থানের কারণে আবরার ভাইদের পরামর্শে শিক্ষার্থীদের একটি অংশ চেরাগী পাহাড় এসে স্লোগান দেয়া শুরু করলে সব শিক্ষার্থীরা ওখানে এসে বড় জমায়েত গড়ে তোলা। সেদিন সেখানে পুলিশলীপ ও আওয়ামী সন্ত্রাসি শৈবাল দাসের গুণ্ডা বাহিনী সাধারণ ছাত্রদের ওপর আক্রমণ চালায় এবং অর্ধশত শিক্ষার্থীকে এরেস্ট করে।

৩০ জুলাই-

মন্ত্রীসভা বৈঠকে জুলাই আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে মঙ্গলবার দেশব্যাপী শোকদিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে দেশের আপামর জনতা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে কালো রং এর বদলে অনলাইন-অফলাইন লাল রং এ ভরে যায়। এইদিন বুঝতে আর বাকি ছিল না যে, ছাত্রদের জুলাই আন্দোলনেকে দেশের প্রতিটি সচেতন নাগরিক সমর্থন করছেন।

*৩১ জুলাই

হত্যা, হামলা, মামলা, গণগ্রেপ্তার ও গুমের প্রতিবাদে বুধবার দেশের সকল আদালত চত্তরে 'মার্চ ফর জাস্টিস' কর্মসূচির ঘোষণা করা হয়। সেদিন আমার ডিউটি থাকায় যেতে পারিনি। তবে আমার কিছু জুনিয়র ও সহপাঠিকে ওই কর্মসূচিতে পাঠিয়েছিলাম।

*৩২ জুলাই (১ আগসট)

কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচী 'রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোজ' পালন করে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্যাম্পাস গুলো।'

"৩৩ জুলাই (২ আগষ্ট)

সারাদেশে গণমিছিলের কর্মসূচী ঘোষিত হয়। জুমার নামাজের পর আন্দরকিল্লা থেকে গণমিছিল শুরু হয়ে নিউমার্কেটে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর রেলস্টেশন হয়ে টাইপারপাসে এসে গণমিছিল শেষ হয়। সেদিন চট্টগ্রামের সর্বস্তরের জনতা রাস্তায় নেমে এসেছিল। ঐদিন রাতে যোষণা আসে ৩ আগস্ট সারাদেশে 'বিক্ষোভ মিছিল' এবং ৪ আগস্ট অনির্দিষ্ট কালের জন্য "সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন"এর।

৩৪ জুলাই (৩ আগস্ট)-

এদিন কেন্দ্রিয় শহীদ মিনার থেকে সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম '৯ দফা'র পরিবর্তে "১ দফা" আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়। যদিও ১দফা দাবি নিয়ে ছাত্রজনতা আরো আগে থেকে আলাপ করছিল। এদিন নিউমার্কেট মোড়ে লক্ষ ছাত্রজনতার নিরাপত্তায় আমাদের শৃঙ্খলা কমিটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল।

"৩৫ জুলাই (৪ আগস্ট)..

এদিন চট্টগ্রামের কর্মসূচী বানচাল করতে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা সচেষ্ট ছিল। বিকাল ৩টায় নিউমার্কেট মোড়ে ছাত্রদের অবস্থানের কথা ছিল। কিন্তু আওয়ামীলীগ ২ টায় একই স্থানে সমাবেশের ডাক দেয়। এরপর ছাত্ররা ১১ টায় আসার ঘোষণা দিলে আওমী সন্ত্রাসিরা ১০ টায় নিউমার্কেট এলাকা দখলের ঘোষণা দেয়। যথারিতি আমাদের শৃঙ্খলা কমিটি ৯:৩০ এর আগেই নিউমার্কেট এলাকার আশেপাশের সবগুলো স্পট কভার করে ফেলে। সেদিন ৯:৩০ এর মধ্যে নিউমার্কেট চত্বরে শত শত ছাত্র জনতা উপস্থিত হয়। কিন্তু দুপুর ১২ টার দিকে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা জড়ো হয়ে পুলিশলীগ সহ ভারী অস্ত্র-সস্ত্র দিয়ে হামলা শুরু করে। পরবর্তীতে ছাত্ররা টিকতে না পেরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন মার্কেট ও ভবনে আটকে পরে। এসব আটকে পরা শিক্ষার্থদের উদ্ধারে অনেক বেগ পেতে হয়। সেদিন আমাদের মেডিকেলের প্রায় ১২ জন মত শিক্ষার্থীও নন্দনকাননে একটা ভবনে আটকা পরেছিল। সেদিন আমাদের মেডিকেলের কিছু দায়িত্বশীল ও ডাঃ আব্দুল মান্নান ভাইসহ আরো অনেকে কয়েকটা আম্বুলেন্স নিয়ে নিয়ে আটকে পড়াদের উদ্ধার করার কাজে লেগে যায়। পরবর্তীতে প্রায় রাত ১০ টার পর আমি আব্দুল মান্নান ভাইকে বলে আমাদের আটকে পরা ভাইদেরকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নামিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিই। সেদিন বিকালে ঘোষণা হয় ৬ আগস্ট 'লংমার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি হবে। কিছুরণ পর সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ ঘোষণা করে 'লংমার্চ টু ঢাকা' পরশু নয়, আগামীকাল ঘোষণা করা হলো।

"৩৬ জুলাই (৫ আগষ্ট)

'লংমার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচিতে দেশের আপামর জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংগ্রহণ করে। চট্টগ্রামের লালদিঘীতে কর্মসূচী দেওয়া হলেও পরবর্তীতে তা বাতিল করা হয়। দুপুর ১২ টার দিকে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট চালু হলে দেশের মানুষ আভাস পেতে থাকে হাসিনা পতনের এবং সেনাপ্রধানের দুপুর ২ টায় জাতির উদ্দেশে ভাষণের ঘোষনা আসে। এরপর জাতীয় টিভি চ্যানেলগুলো খুনি স্বৈরাচার হাসিনার পদত্যাগের বিষয়টা প্রচার করে। দেশের মানুষ বিজয়ের উল্লাসে মেতে উঠে। আমরা (আমি, হাসপাতালের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী, রোগীর আত্মীয় স্বজন) তৎক্ষণাৎ হাসপাতাল ভবনের ২য় তলায় জামাতের সহিত (আমার ইমামতিতে) শোকরানার নামাজ আদায় করি। সবাই খুশিতে নামাজে কান্না করে করে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি। আল্লাহ আমাদের এক মহান বিজয় দান করেছেন এবং বাংলাদেশকে ভারতীর আধিপত্যবাদের গোলাম খুনি স্বৈরাচার হাসিনার আওয়ামী শাসন থেকে মুক্ত করে ২য় স্বাধীনতা দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

আমার স্মৃতিপটে
রক্তাক্ত জুলাইয়ের দিনগুলো

- ইমন হোসাইন, এমবিবিএস ৮ম ব্যাচ, রোল: ২৫

জুলাই ১, ২০২৫: ২৪ এর জুলাই পেরিয়ে আমরা আরেকটি জুলাইয়ে পদার্পন করেছি।২৪ এর রক্তাক্ত জুলাইয়ের ১ বছর অতিবাহিত হলেও আমার স্মৃতিতে 'জুলাই' এখনো চির জীবন্ত, অমলিন। জুলাইয়ের দিনগুলো যখন স্মৃতিপটে ভেসে উঠে বার বার ব্যথাবিধুর, মর্মস্পর্শী, মর্মান্তিক ভাবনায় নিজেকে হারিয়ে ফেলি।

জুলাই আন্দোলনের প্রেক্ষাপট:

দিনটি ছিলো ২০২৪ সালের ৫ ই জুনাসেদিন ২০১৮ সালের ৪ ই অক্টোবর ১ম ও ২য় শ্রেণীর সরকারী চাকরিতে কোটাব্যবস্থা বাতিল করে যে পরিপত্র জারি করা হয়েছিলো, সেটি বিচারপতি কে. এম. কামরুল কাদের ও বিচারপতি খিজির হায়াতের হাইকোর্ট বেঞ্চ বাতিল ঘোষণা করে রায় দেন। রায় প্রকাশিত হবার পর ঢাকা সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কোটা সংস্কারের দাবিতে সর্বপ্রথম একত্রিত হয় পরবর্তীতে ইন ও গ্রীষ্মকালীন ছুটির কারণে প্রতিবাদ কিছুটা স্তর্মিত হয়।পরবর্তী সময়ে কোটা সংস্কারের সেই আন্দোলন ফ্যাসিস্ট হাসিনা পতনের ১ দফা আন্দোলনে রূপ নেয়া।শিক্ষার্থীদের সেই আন্দোলন রুপ নেয় ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে।যার পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৪ সালের ৫ ই আগস্ট তথা ৩৬ শে জুলাই স্বৈরাচার হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

কোটা সংস্কার আন্দোলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে শুরু হলেও আন্দোলনের ঝাঁঝ সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিলো "স্ফুলিঙ্গের মত।" বীর চট্টলার রাজপথে আমার স্মৃতিচিত্রে থাকা দিনগুলোর কথা তুলে ধরার চেষ্টা করছি ধারাবাহিকভাবে।

৬ জুলাই: বীর চট্টলায় আন্দোলনের শুরুটা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে হলেও ৬ ই জুলাই আন্দোলন ষোলশহর স্টেশনে স্থানান্তরিত হয়। টিউশন শেষ করে সেদিন মহসিন কলেজের বন্ধু শহীদের সাথে আন্দোলনে যোগ দেই।

ঈদ

৮ জুলাই: এদিন 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচীর অংশ হিসাবে আমরা ষোলশহর, ২ নং গেইট এলাকা কয়েকঘন্টার জন্য অবরোধ করে রেখেছিলাম।

১২ জুলাই: বিগত কয়েকদিন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের উপর হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রাম নগরীতে প্রায় ১০ কি.মি. সড়ক জুড়ে লংমার্চ কর্মসূচি পালিত হয়। সেদিন ২ নং গেট, প্রবর্তক, চকবাজার, জামালখান, কাজীর দেউরী হয়ে ২নং গেইটে এসে লংমার্চ সমাপ্ত হয়েছিলো।

১৪ জুলাই: সারাদিনের ক্লান্তি শেষে বাসায় ফিরলাম। ফেসবুক স্কুল করার সময় একটি নিউজ চোখের সামনে আসে। স্বৈরাচার হাসিনা কোন এক সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে আন্দোলনকারীদেরকে রাজাকারের নাতি-পুতি' আখ্যা দেয়া মুহুর্তের মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ সারাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একট স্লোগান মুহুর্তেই ছড়িয়ে পড়ে- তুমি কে. আমি কে, রাজাকার রাজাকার। কে বলেছে, কে বলেছে, সরকার সরকার। পরবর্তী দিনগুলোতে এই স্লোগান রাজপথকে আরো বেশী উদ্দীপ্ত করেছিলো।

আমার স্মৃতিপটে রক্তাক্ত জুলাইয়ের দিনগুলো

১৫ জুলাই, চট্টগ্রামের আন্দোলন মূলত এদিন থেকে সংঘর্ষে রূপ নেয়। সেদিনই প্রথম ঢালাও ভাবে ছাত্রলীগ আমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শাটল ট্রেন আটকে দিয়ে সেদিন তারা নানাভাবে বাঁধা দিয়েছিলো। থেমে থেমে সেদিন ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের সাথে আমাদের সংঘর্ষ চলতে থাকে।সেদিন মুরাদপুর মোড়ে এসে কর্মসূচি সমাপ্ত হয়েছিলো। এইদিন পুরো বাংলাদেশ দেখেছিলো মুখে নারীবাদের বুলি আওড়ানো স্বৈরাচার হাসিনার পোষ্য ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা কিভাবে আমাদের বোনদের উপর নির্মমভাবে ঝাপিয়ে পড়েছিলো ঢাকার রাজপথে সেদিন আমাদের বোনেরা ছিলো নির্যাতিত, নিষ্পেষিত।

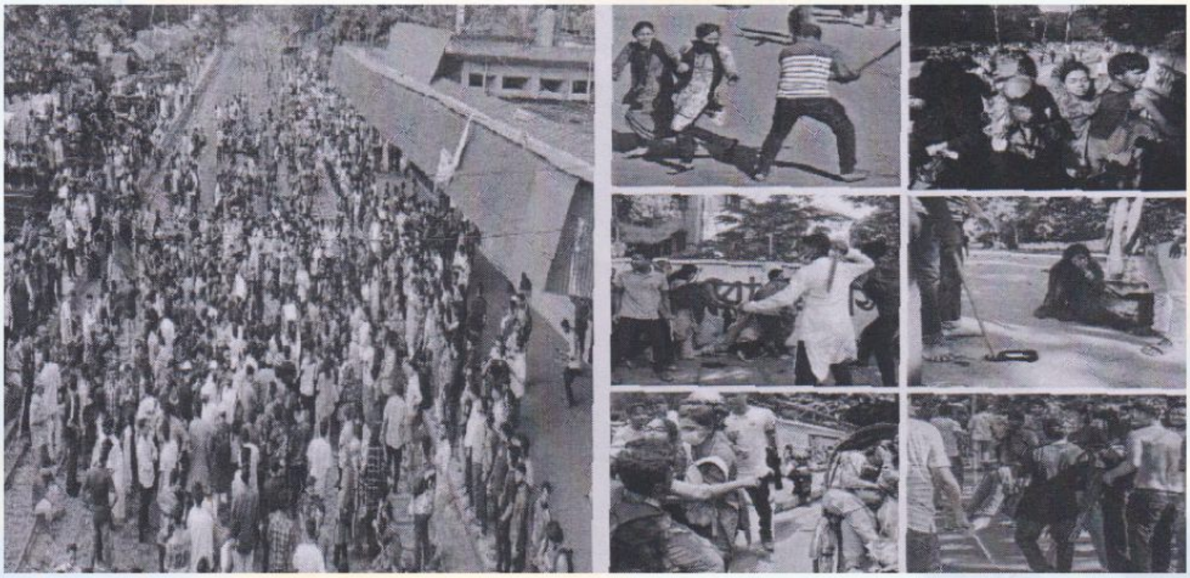

১৬ জুলাই। এ জীবনে কখনো অস্ত্রের মুখোমুখি হবো কল্পনা করিনি। স্মৃতিপটে যখনই ১৬ জুলাই ভেসে আসে, আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারি না।অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় বার বার। শহীদ আবু সাইদের বুক পেতে দেয়া দৃশ্য ৫৫ হাজার বর্গমাইলের ন্যূনতম মনুষ্যত্ব লালন করা প্রতিটি মানুষকে কাঁদিয়েছিলো। এই এক আবু সাইদ পরবর্তী সময়ের আন্দোলনে আশার, চেতনার স্পৃহা হয়ে উঠেছিলেন। সাহস জুগিয়েছিলো আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষেপে।

দিনটি ছিলো মঙ্গলবার। এদিনও যথারীতি কলেজে ক্লাস করতে গেলাম। তৎকালীন বেসরকারী মেডিকেল ছাত্রশিবিরের সভাপতি মুহাম্মদ ভাইয়ের ফোন।বললেন, 'ভাই আপনাদের কয়েকজনকে শৃঙ্খলা টিমে থাকতে হবে আজকে। ক্লাস শেষ করে তাড়াতাড়ি মুরাদপুর চলে যান।মহানগর উত্তরের এক দায়িত্বশীলের ফোন নাম্বারও দিলেন যোগাযোগের জন্য ক্লাস শেষ করে মুরাদপুরের উদ্দেশ্যে রওনা করলাম। যেতে যেতে আরো কয়েকজনের সাথে যোগাযোগ করে মুরাদপুর আসতে বললাম। সেদিন ছাত্র-জনতা ষোলশহর স্টেশনে অবস্থান নেওয়ার আগেই চট্টগ্রামের কুখ্যাত সন্ত্রাসী নুরুল আজিম রনির নেতৃত্বে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা সেখানে অবস্থান নেয়া। যার পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনকারীরা কিছুটা দিকনির্দেশনাহীন হয়ে পড়ে। একেকজন একেকদিকে অবস্থান নেয়। আমি মুরাদপুর পৌঁছাতে পৌঁছাতে দেখি ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা মুরাদপুরে অবস্থানরত শৃঙ্খলাটিমের ভাইদের উপর আক্রমণ করে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আমরা ততক্ষণে আমি ও আমার কয়েকজন সহযোদ্ধা চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ড পৌঁছে দেখি রনির নেতৃত্বে চট্টলামের ছাত্রলীগ ষোলশহর থেকে মিছিল সহকারে মুরাদপুর কেন্দ্রিক যাচ্ছিল। একটা চায়ের দোকানে বসে আমি, বন্ধু শহীদ সহ বাকি সহযোদ্ধারা প্রতিনিয়ত বৈষম্যবিরোধীর পেইজে, গ্রুপে আপডেট খুঁজছিলাম পরবর্তীতে কৌশলে আমরা ২ নং গেটে অন্যান্য আন্দোলনকারীদের সাথে যুক্ত হয়ে জমায়েত গড়ে তুলার চেষ্টা করি।সেখানে গিয়ে দেখা হয় এমবিবিএস ১০ম ব্যাচের আলমগীর ও রাফির সাথে পরিস্থিতি বুঝে উঠার আগেই অস্ত্র সজ্জিত ছাত্রলীগ আমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। সাধারণ শিক্ষার্থীরা দিশাহীন হয়ে দিকবিদিকশুন্য হয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে। আমার সহযোদ্ধাদের সবাইকেই হারিয়ে ফেলি। তখনই চট্টগ্রাম

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ভাই টেনে মিনা বাজারে ঢুকিয়ে শাটার বন্ধ করে দেন। ৩০ মিনিট সেখানে অবস্থান করে পরিস্থিতি বুঝার চেষ্টা করছিলাম। সবার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিলাম।এমনই সময় চোখে ভেসে আসল্যে শহীদ আবু সাইদকে হত্যা করার ভিডিওটি। অশ্রুসিক্ত হলাম বাসা থেকে আম্মু বার বার ফোন দিচ্ছেন, চিন্তা করছিলেন খুব, সাবধানে থাকতে বললেন। এরমধ্যে আপডেট পেলাম ছাত্ররা মুরাদপুর একত্রিত হচ্ছে।এমন সময় আমরা যারা মিনা বাজারে আটকে ছিলাম, সবাই মুরাদপুর মুভ করতে চাইলে মিনা বাজার কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার কথা ভেবে আমাদের বের হতে দিতে চাচ্ছিলেন না। পরে এক প্রকার জোর করেই আমরা কৌশলে নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি হয়ে মুরাদপুরে যোগ দিলাম পাল্টাপাল্টি সংঘর্ষ চলছিলো তখন ছাত্রলীগ-আওয়ামীলীগ-যুবলীগের সর্বস্তরের সন্ত্রাসীরা সেদিন অস্ত্রসজ্জিত হয়ে প্রস্তুতি নিয়েই এসেছিলো। ছাত্রজনতা কেবল পাথর নিক্ষেপ করেই তাদের মোকাবিলা করেছিলো। অস্ত্র চালাতে চালাতে রনি, বাবরের নেতৃত্বে তারা অগ্রসর হচ্ছিলো। অনেক ভাইকে রক্তাক্ত হতে দেখেছি মুহূর্তের মধ্যেই। ইতোমধ্যেই নিহতের ঘটনাও কানে আসে। বিভিন্ন বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকেও সন্ত্রাসীরা আমাদের উপর গুলিবর্ষণ করতে থাকে। একদিকে সন্ত্রাসীদের মোকাবেলা, অপরদিকে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলো শৃঙ্খলা টমের ভাইয়েরা। সেদিন চার স্তরের শৃঙ্খলা টিম গঠন করে মহানগর শিবির। এক পর্যায়ে লীগের সন্ত্রাসীরা প্রায় পরাভূত। বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে গুলিবর্ষণকারী লীগের উপর ছাত্রজনতা তেড়ে গেলে তারা কেউ কেউ ছাদ থেকে লাফ দেয়। পুরো সময়টায় পুলিশ নিশ্চুপ ছিলো। বরং লীগের সাথে মিলে পুলিশলীগের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ক্লান্ত, শ্রান্ত হয়ে মোহাম্মদপুর এক বন্ধুর বাসায় আশ্রয় নেয়। বাসা থেকে বার বার ফোন বসে। আম্মাকে বলি, ভালো আছি। দোয়া কইরেন। সেদিন আমাদের ৩ ভাই শহীদ হয়েছিলো। শহীদ ফয়সাল আহমেদ শান্ত, শহীদ ওয়াসিম আকরাম, শহীদ ফারুক ভাই সেদিন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন ১৬ জুলাই থেকে মনের ভেতর জেদ প্রবল হতে থাকে। এরপর যতদিনই আন্দোলনে বের হয়েছি মৃত্যুর প্রস্তুতি নিয়েই বের হয়েছি, শাহাদাতের তামান্না করেছি।

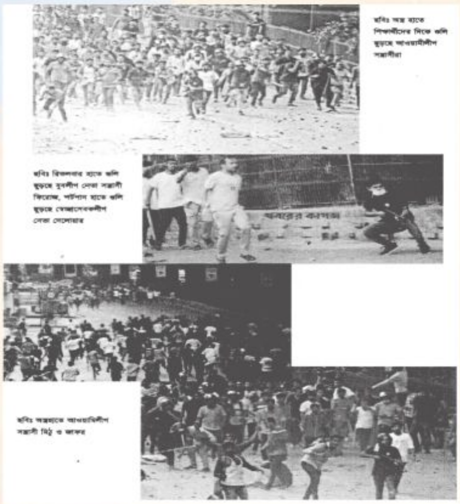

১৭ জুলাইঃ ১৬ ই জুলাই চট্টগ্রামে ভয়াবহ হত্যাকান্ডে কিছুটা স্থবির হয়ে যায় পুরো চট্টগ্রাম নগরী ১৬ই জুলাই চট্টগ্রামে ৩ জনসহ সারাদেশে নিহত ভাইদের গায়েবানা জানাযার ঘোষণা দেয়া হয়। জানাযার স্থান নির্ধারন হয় লালদিঘীর ময়দানে, বিকাল ৪ টায়। পথে পথে পুলিশ, সন্ত্রাসীলীগের সশস্ত্র অবস্থান তোয়াক্কা না করে করে হাজার হাজার শোকাহত ছাত্রজনতা লালদিঘী ময়দানে উপস্থিত হয়। বিভিন্ন স্পটে সেদিন শিবিরের ভাইয়েরা শৃঙ্খলাবিভাগের দায়িত্ব পালন করে। তৎকালীন বেসরকারী মেডিকেল শাখার সভাপতি মুহাম্মদ ভাই, আইডিসি ওয়ার্ডের দায়িত্বশীল সায়েদুল করিম ভাই, সাইম ভাই, আব্দুল্লাহ ভাই, মহসিন কলেজের বন্ধু শহীদসহ আমরা লালদিঘী মসজিদ এলাকায় শৃঙ্খলাবিভাগের দায়িত্বপালন করেছিলাম। শৃঙ্খলা বিভাগের সুন্দর ভূমিকায় এদিন মিছিল সহকারে আন্দরকিল্লা এসে শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি সমাপ্ত হয়।

১৮ জুলাইঃ সারাদেশে ১৮ ও ১৯ জুলাই সর্বাত্মক অবরোধ ঘোষনা করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ব্রীজ অবস্থান নিয়ে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সড়ক অবরোধের সিদ্ধান্ত হয়। বহদ্দারহাট থেকে একসাথে যুক্ত হয় ডেন্টালের আসাদ, রকি আর এমবিবিএসের আলমগীর। আমরা নতুন ব্রীজ পৌঁছালে আমাদের সাথে মুহাম্মদ ভাই এসে যুক্ত হন।ফটাখানেক সেখানে অবস্থানের পর বিনা উস্কানিতে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল দিয়ে আক্রমণ শুরু করে টিয়ারশেলের গ্যাসে জ্ঞান হারাবার মত অবস্থা হয়েছিলো। কাউকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। পরে কিছুক্ষণ সংঘর্ষের পর আমি আর মুহাম্মদ ভাই ডিসি রোড হয়ে বহদ্দারহাট আসি। সেখান থেকে এক বন্ধুর সহায়তায় আহত অবস্থায় বাসায় ফিরি। বাসায় ফিরে খবর পাই, ছাত্ররা বহদ্দারহাটে জমায়েত হচ্ছে। দ্রুত আমি আর শহীদ রওয়ানা দিই। সেখানে পৌঁছালে কিছুক্ষনের মধ্যে বহদ্দারহাট কাঁচাবাজার, মোহাম্মদপুর এলাকায় উৎপেতে থাকা লীগের সন্ত্রাসীরা হামলা শুরু করলে পুলিশ বাহিনীও আমাদের উপর টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে মুরাদপুর, বহদ্দারহাট, কাপাসগোলা এলাকায় সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছিলো পরে আহত অবস্থায় ষোলকবহরের এক বিল্ডিংয়ে আশ্রয় নেয়া অপরিচিত এক দম্পতি আমাকে তাদের বাসায় নিয়ে যায়। খেতে দেয়, বিশ্রাম করতে দেয়। আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো তাদের প্রতি। এমন সময় চট্টগ্রামের সমন্বয়ক জুবায়ের ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স ম্যানেজ করে দিতে বললে বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগ করে সেখানে। অ্যাম্বুলেন্স পাঠানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় জানতে পারি আমার মেডিকেলের একজন পুলিশের ছিটাগুলিতে আহত হয়। খবর নিয়ে জানতে পারি আমার ৮ম ব্যাচের বন্ধু এজাজ আহত হয়। পুলিশের আক্রমনে জখম হয় তার শরীর।পরে ফোনে তাকে পেলে সে একটা পাবলিক টয়লেটে অবস্থান করছিলো পরবর্তীতে কিছু ভাইয়ের সহায়তায় সে আমাদের মেডিকেলে এসে চিকিৎসা নেয়। অন্যদিকে, ৭ম ব্যাচের ইরফান ভাইসহ কয়েকজন ফ্লাইওভারে আটকে থাকার খবর আসে।আশ্রয়কৃত বাসা থেকে বের হয়ে এসে বহদ্দারহাট আসি। উত্তপ্ত ছাত্রজনতা বহদ্দারহাট পুলিশবক্সে আগুন দেয় সময় যত গড়িয়ে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিলো, পুলিশও তার নির্মমতা শুরু করেছিলো। সেদিন মোহাম্মদপুর, পানিভবন গলিসহ বহদ্দারহাট যেন এক মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছিলো এদিন চট্টগ্রামের ৪ জন ভাই শহীদ হয়েছিলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হৃদয় চন্দ্র বড়ুয়া, তানভীর সিদ্দিকী, মোঃ ইমাদ সহ সায়মন নামের এক মুদির দোকানের কর্মচারী শহীদ হয়। শত শত ভাইবোন সেদিন, অলিগলিতে আহত অবস্থায় পড়ে ছিলো। ১ জন আহত ভাইকে নিয়ে আমরা ২ জন পার্কভিউ হাসপাতালে নিয়ে যায়। এদিন রাত থেকে সারাদেশে ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়।

১৯ জুলাই ১৯ জুলাই, জুমাবার। চট্টগ্রামের ৪ জন শহীদ সহ সারাদেশে শহীদ হওয়া ভাইদের জন্য গায়েবানা নামাজের ঘোষনা আসে। মূলত ইন্টারনেটবিহীন সময়ে আমরা ফোনে ফোনে যোগাযোগ করে একত্রিত হই। আমি, শহীদ, আসাদ, আব্দুল্লাহ ভাই, সায়েমুল করিম ভাই, আমাদের প্যাথলজির ইকবাল স্যার সহ আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদে নামাজ শেষ করে মিছিলের সাথে লালদিঘীর ময়দানে যাচ্ছিলাম। যাওয়ার পথে বিক্ষুদ্ধ ছাত্র-জনতা ছাত্রলীগের অফিসে পাথর মেরে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে। শান্তিপূর্ণ জানাযা শেষে মিছিল নিউমার্কেট, লাভলেইন হয়ে কাজীর দেউরী এসে পৌঁছালে পুলিশ মিছিলের উপর টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ শুরু করে। জুতা ছিঁড়ে গেলে তপ্ত রাস্তায় পায়ে ব্যথা পাই। পরে গণিবেকারী এসে বন্ধু আখইয়ারের বাসায় আশ্রয় নেই। পরে আখইয়ারের বাসা থেকে চকবাজার এসে বন্ধু শহীদের সাথে বাসার উদ্দেশ্যে বহদ্দারহাট পৌঁছালে আবারো পুলিশী বাঁধার সম্মুখীন হই। একদিকে পুলিশ, অন্যদিকে ছাত্রলীগ। বড় গ্যারেজের গলি হয়ে পার্কভিউ হাসপাতালের রোডটায় বের হওয়ার চেষ্টা করেছিলাম, সেখানেও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের বাঁধার সম্মুখীন হই। পরবর্তীতে নানা অলি গলি পেরিয়ে রাত ১০ টায় বাসায় ফিরি।

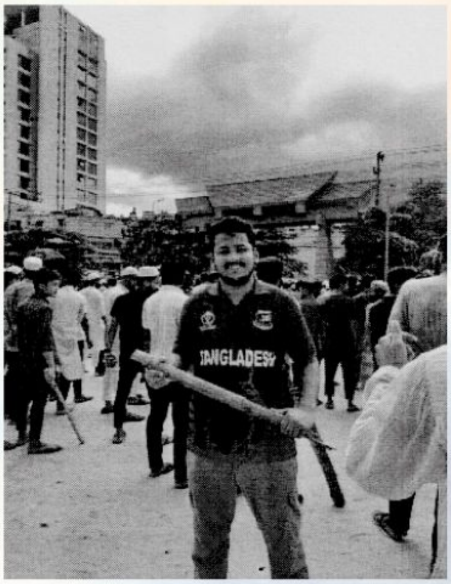

১৯-১৮ জুলাই: ১৮-২৪ তারিখ সারাদেশে সকল ধরনের ইন্টারনেট সেবা বন্ধ থাকে।২৪ জুলাই ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সীমিত চালু হলেও তা অকার্যকর থাকে ২৩-২৮ তারিখ চট্টগ্রামে সকল কর্মসূচি বন্ধ থাকে। তবে গণগ্রেপ্তার চালু করে রাতের আধারে তল্লাশির নামে গ্রেপ্তার করা হয় শত শত ভাইদের। এই দিনগুলোতে একেকদিন একেক বাসায় রাত্রিযাপন করি। বিভিন্ন নাম্বার পরিবর্তন করি প্রতিটি রাত ছিলো ভয়ের, উৎকণ্ঠার।

বলা বাহুল্য, ২১ জুলাই হাইকোর্ট সরকারী চাকুরীতে ৯৩ শতাংশ মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়ার নির্দেশনা দেয়ামূলত যা ছিলো আন্দোলনকে দমানোর কৌশলমাত্র এদিনই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ৯ দফা ঘোষনা করে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়। ২৮ তারিখ রাতে ৬ সমন্বয়ককে জিম্মি ও নির্যাতন করে আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণার মধ্য দিয়ে ডিবি অফিসে এক নাটক মঞ্চস্থ হলে দেশবাসীর আর বুঝতে সমস্যা হয় নি যে ফ্যাসিস্ট হাসিনার প্রেসক্রিপশনে এসব করা হচ্ছে। সেই প্রত্যাহারের ঘটনা সারাদেশে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করে। আমরাও সেই ঘোষণা প্রত্যাখান করে সিআইএমসির প্যাডে বিবৃতি দিয়েছিলাম। জোরপূর্বক বিবৃতি আদায়ের প্রতিবাদে ২৯ জুলাই থেকে রাজপথে আবার আন্দোলন চালিয়ে যাবার ঘোষণা আসে।

স্পষ্ট বিবৃতি

আমরা শিক্ষার্থীবৃন্দ

২৯ জুলাই, ২০২৪

২৯-৩০ জুলাই: শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকার কারণে সেদিনের জামালখান প্রেসক্লাব চত্বরে সে বিক্ষোভ কর্মসূচি দেয়া হয়েছিলো সেটাতে সেদিন অংশ নিতে পারিনি। সেদিন চেরাগী পাহাড় মোড়ে অবস্থানরত ছাত্রদের পুলিশ গ্রেপ্তার করলে পুলিশের গাড়ির সামনে আমাদের বোনেরা প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। পুলিশ তাদের উপর ও টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেডের হামলা করে।

৩০ জুলাই মন্ত্রীসভার বৈঠকে কোটা আন্দোলনকে ঘিরে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে ৩০ জুলাই সারাদেশে শোক পালন করার সিদ্ধান্ত নিলে, বাংলাদেশের জনগণ এই প্রহসনমূলক শোককে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করে। সর্বস্তরের মানুষ প্রহসনমূলক শোকের কালোর পরিবর্তে বিপ্লবের লাল রঙে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যেন আন্দোলনের স্পৃহাকে বাড়িয়ে দিচ্ছিলো যা ক্ষমতাসীন আওয়ামী মসনদকে নাড়িয়ে দিয়েছিলো।

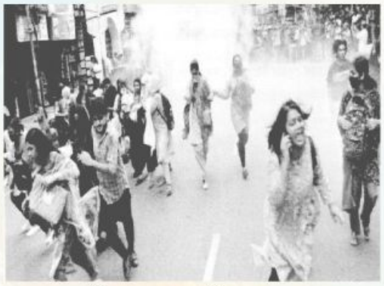

৩১ জুলাই। হত্যা, গণগ্রেপ্তার, গুমের প্রতিবাদে এদিন 'মার্চ ফর জাস্টিস' কর্মসূচিতে সকাল ১০ টায় আমরা আদালত প্রাঙ্গনে গিয়ে পৌঁছালে পুলিশ শুরুতে বাঁধা দিলেও, পরবর্তীতে ছাত্রজনতার ঢলে তারা টিকতে পারে নি। সেদিন সকল ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়েছিলো আদালত প্রাঙ্গন। আইনজীবীরা এদিন আমাদের নানাভাবে সহযোগিতা করেছিলো। খাবার, পানি থেকে শুরু করে আন্দোলনকারীদের প্রটোকল দিয়ে তারা নিউমার্কেট অব্দি এসে সেদিনের কর্মসূচী নির্বিঘ্নে সফল করে।

৩২ জুলাইঃ এদিন 'Remembering Our Heroes' কর্মসূচি পালিত হয় সারাদেশে চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে গ্রাফিতি অংকন করতেও দেখা যায়।

৩৩ জুলাইঃ এদিন সারাদেশে গণমিছিল কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। আমরা আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করি। খতিব সাহেবের আখেরী মোনাজাত জনতাকে আরো উদ্দীপ্ত করে তোলে নামাজ শেষে হাজার হাজার ছাত্রজনতার অংশগ্রহণে গণমিছিল টাইগারপাস এসে সমাপ্ত হয়।

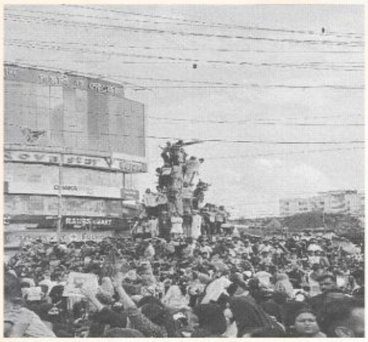

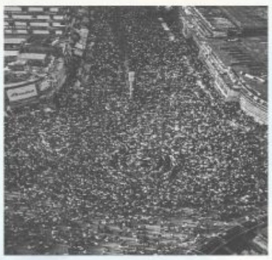

৩৪ জুলাই। ৩৪ জুলাই সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম শহীদ মিনার থেকে ৯ দফায় পরিবর্তে ১ দফার সরকার পতনের ঘোষণা দেয়া শেষ কিছুদিন ঢাকাসহ সারাদেশে আন্দোলন কিছুটা স্থবির হলেও বীর চট্টলা আন্দোলনকে টিকিয়ে রেখেছিল। এদিন বিকাল ৩ টায় নিউমার্কেটে লাখ লাখ ছাত্রজনতার সাথে মেডিকেল টিম নিয়ে আমি যোগ দিই। এদিন রাত থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছাত্রলীগ, যুবলীগ, আওয়ামীলীগ প্রদিন আন্দোলনকারীদের প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়ে আসছিলো।

৩৫ জুলাইঃ ৩৫ জুলাই থেকেই সর্বোত্মক অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি শুরু হয়। এদিন শুরুতে বিকাল ৩ টায় নিউমার্কেট জমায়েতের কথা থাকলেও, লীগের সন্ত্রাসীরা দুপুর ২ টায় নিউমার্কেটে তাদের কর্মসূচী ঘোষণা করে। এর দরুণ আমাদের কর্মসূচিও সকাল ১১ টায় এগিয়ে আনা হয়। ধীরে ধীরে ছাত্র জনতা একত্রিত হতে থাকোমেডিকেল টিম নিয়ে আমরা সেখানে অবস্থান করছিলাম মুহূর্তের মধ্যেই পুলিশ ও লীগের সন্ত্রাসীরা ৩ দিক থেকে আমাদের উপর গুলি বর্ষণ করতে থাকে। এদিন পুরো চট্টগ্রামের লীগের সকল নেতাকর্মীরা তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ আর মরণ কামড় দিতেই সর্বশক্তি নিয়ে জনতার উপর ঝাপিয়ে পড়ে। আহত কয়েকজন বন্ধুকে দেখতে চট্টগ্রাম মেডিকেলে গেলে ইমার্জেন্সির সামনে চমেক ছাত্রলীগের হামলার শিকার হয়, দীর্ঘসময় অবরুদ্ধ থাকি। পরে এক বন্ধুর সহায়তায় নিরাপদে বাসায় ফিরি।এর মধ্যে খবর আসে আমার মেডিকেলের বন্ধু এজাজ, তাকওয়া, ৭ম ব্যাচের সাজেল ভাই, ফাহাদ ভাই, ৯ম ব্যাচের শোয়াইব, জারিফা আন্দালিব, ডেন্টালের রকিসহ বেশ কয়েকজন নন্দনকানন আটকা পড়ে। বন্ধু আহাদ তার নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদের উদ্ধার করে আর পরে আমাদের মেডিকেলের অ্যাম্বুলেন্স এসে নিরাপদে তাদের বাসায় পৌঁছে দেয়। এদিন গুলিবিদ্ধ হয় আমার বন্ধু শাফীন। লীগের সন্ত্রাসীদের পিস্তলের বুলেট তার রেডিয়াস-আলনা ভেদ করে কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার করেছিলো। ন্যাশনাল হাসপাতালে তার অপারেশন সফলভাবে সম্পন্ন হয়। অনেক ভাই এদিন আহত হয়।

ছবিঃ নিউ মার্কেট এলাকায় অস্ত্র হাতে শিক্ষার্থীদের উপর হামলা করে আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনী। শেষের ছবিতে অস্ত্র হাতে জামালখানের কাউন্সিলর শৈবাল দাস সুমন্

এদিনই ঢাকা থেকে সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ ঘোষনা দেয়, পরিস্থিতি পর্যালোচনায় 'মার্চ টু ঢাকা ৬ আগস্টের পরিবর্তে পরদিন ৫ আগস্ট তথা ৩৬ জুলাই।

জনতা ঢাকা যেতে শুরু করে সেদিন রাতেই। আমি ঢাকা যেতে পারি নি। সেদিনের রাত যেন এক নতুন দিনের অপেক্ষার মনে এক আশার আলো উকি দিয়ে যাচ্ছিলো। আবার উৎকণ্ঠাও কাজ করছিলো। পরিবারের সবাই এক সাথে তাহাজ্জুদ পড়েছিলাম। আল্লাহর কাছে কেঁদেছিলাম। অঝোরে কেঁদেছিলাম।

৩৬ জুলাই। ঘুমবিহীন রাতের শেষে সকাল হলো। সারাদেশে আবারও ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলো। সারাদেশ থেকে ঢাকাগামী মানুষ নানাভাবে বাঁধার। সম্মুখীন হলো। পরিস্থিতি বুঝার চেষ্টা করছিলাম। ঢাকার পরিচিতদের ফোনের পর ফোন করছিলাম।এমন সময় জানতে পারি সেনাপ্রধান জরুরি ভাষণ দিবেন। পরিস্থিতি কিছুটা বুঝতে পারলাম। তখন আমার বাসায় বন্ধু শহীদ ছিলো। তাকে নিয়ে দুপুর ২ টায় আমার মেডিকেলের দিকে গেলাম। হাসপাতালের ২য় তলার ল্যাব ফ্লোরে টিভির সামনে সবাই নিউজ দেখছিলাম। এমনই সময় একটা নিউজ, একটা হেডলাইন যমুনা টিভিতে ভেসে আসলো। জনতার 'ফতেহ গণভবন' আর নিশ্চিত পরাজয় মেনে ফ্যাসিস্ট হাসিনা হেলিকপ্টার যোগে পালিয়েছে। সকলে সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম। একজন আরেকজনকে ঝড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদলাম। মুহাম্মদ ভাইয়ের ইমামতিতে সেখানেই শোকরানার নামাজ হয়। সেখান থেকেই মেডিকেলের সকল কর্মকর্তা, স্টাফ, ছাত্ররা মিছিল নিয়ে আমরা বহদ্দারহাট ছাত্রজনতার বিজয় মিছিলে যোগ দেই। এরপরের ইতিহাস সবারই জানা। নিরবে, নিভৃতে আমি অবলোকন করেছি আমার রবের সাহায্য। ৩৬ শে জুলাই তথা ৫ই আগস্ট ১৬ বছরের ফ্যাসিজমের অবসান হয়।

অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশ পুণঃনির্মাণে ছাত্র জনতা রাস্তায় নেমে এসেছিলো দেশ সংস্কারে। কখনো ট্রাফিকের ভূমিকায়, কখনো গ্রাফিতি কিংবা কখনো হামলার আশঙ্কায় মন্দির পাহারা দিয়ে।

এভাবেই প্রায় ২০০০ শহীদের রক্তের বিনিময়ে, নানা ত্যাগ তিতিক্ষার পরে, রক্তাক্ত জুলাইয়ের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এক ইতিহাস রচিত হয়েছিলো ৫৫ হাজার বর্গমাইলের সোনার বাংলাদেশে।

তারা পড়ে না

- নুসরাত জাহান আনিকা
৮ম ব্যাচ
রোল: ১১

১। বৃষ্টির দিন
১৫ জুলাই ২০২৪।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের বারান্দায়
বসে ছিল নাহিয়ান। বৃষ্টি পড়ছিল ধীরে ধীরে, যেমন করে দেশের মানুষ তখন চোখের পানি ফেলছিল। বাইরে পুলিশের লাঠির শব্দ ভেসে আসছিল টিনের উপর বৃষ্টির মতো।
তাঁর পাশে একটি ছেঁড়া খাতা। তাতে লেখা ছিল:
> "আমরা কোটা চাই না, আমরাও কোটা চাই না-আমরা চাই ন্যায্যতা। চাই বিচার।"
গত তিনদিনে শাহবাগে কমপক্ষে ১২ জন শিক্ষার্থী নিখোঁজ, ৪ জন আহত হয়ে হাসপাতালে, ১ জন নিহত।
তারা কি কখনো শুধু কোটার কথা বলেছিল? না।
তারা বলেছিল:
"কোটা থাক, তবে সংবেদনশীলভাবে; যেন গরিবও পড়ে, মুক্তিযোদ্ধার সন্তানও পড়ে, কিন্তু মেধাবীটিও পড়ে।"
নাহিয়ানের চোখের সামনে তখনো ভাসছিল রেজওয়ানের শরীরটা-উঠান থেকে রক্তে ভেজা হয়ে
উঠছিল মাটি।
তাকে ধরে টানতে টানতে সাদা পোশাকের লোকেরা গাড়িতে তুলেছিল।
২। ভয়
ঢাকার রাস্তায় তখন ভয়।
প্রতিটি দরজা বন্ধ।
মেসের ছেলেরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কেউ কোনো খবরে নাম বলতে চায় না।
মা ফোন করে বলেছে,
> "বাবা, থাক না এসবের বাইরে। তোদেরকে নিয়ে তো মানুষ মেরে দিচ্ছে।"
নাহিয়ান উত্তর দিতে পারেনি।
সে জানে, আজ যদি সে চুপ করে যায়, আগামীকাল কেউই আর বলবে না- "বাংলাদেশ একটি ছাত্রের দেশ।"
তবু, ভয় সে পেত।
রাত ২টায় দরজা কেউ ধাক্কা দিলে বুক কেঁপে উঠতো।
কিন্তু একবার রেজওয়ান বলেছিল:
> "ভয় মানে আমি থেমে যাই না। ভয় মানে আমি বুঝি-কতটা মূল্য দিচ্ছি সত্যের জন্য।"

৩। মোমবাতির রাত
১৮ জুলাই।
আন্দোলনের ৭ম দিন।
শাহবাগের সব পথ বন্ধ, মোবাইল নেটওয়ার্ক অচল। তবু সেই রাতে শহীদ মিনারে জড়ো হয় শত শত মানুষ। কেউ চিৎকার করে না। শুধু একেকজন এসে একটি করে মোমবাতি জ্বালায়।
একটি মেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল সামনে-রুবাইয়া। তার ভাই রায়হান সেই দিন নিখোঁজ।
রুবাইয়া শুধু বলেছিল:
> "আমার ভাই পড়তে এসেছিল। রাজনীতি করতে না। ওর মতো ছেলেরা হারিয়ে গেলে, এই দেশ হারাবে আলোর পথ।"
কেউ স্লোগান দেয়নি।
তবে মানুষ একসাথে দাঁড়িয়েছিল-আর এটাই ছিল তাদের সাহস।
৪। রাষ্ট্রের চুপ, ছাত্রের জেদ
একদিন, দুইদিন, দশদিন...
মিডিয়ায় রাষ্ট্রীয় ভাষ্য: "তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খল দুষ্কৃতকারী আছে।"
কিন্তু ক্যাম্পাসে ঝুলছিল প্ল্যাকার্ড-"আমরা কারো বিরুদ্ধে না। আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে।"
দেশজুড়ে তরুণরা ছবি পোস্ট করছিলো-চোখের নিচে কালো দাগ, হাতে খোলা বই, পাশে লেখা:
> "আমি পড়ি। আমাকেও কোটা দিতে হবে একদিন? কিংবা গুলি?"
একজন বৃদ্ধ মুক্তিযোদ্ধা লিখলেন খোলা চিঠি:
> "আমার নাম নিয়ে ওদের গুলি চালানো হোক-এটা আমি চাই না।"
৫। সমাপ্তি, না শেষ?
শেষে আন্দোলন স্থগিত হলো-না কোনো বড় জয়, না স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি। তবে দেশজুড়ে ছড়িয়ে গেল কিছু নাম-রেজওয়ান, রুবাইয়া, নাহিয়ান। আরও কয়েকজন, যাদের ছবি এখন দেয়ালে ঝুলে- "তারা হারিয়ে গেছে।"
নাহিয়ান তার খাতায় লিখলো শেষ বাক্য:
> "আমরা হেরেছি হয়তো, কিন্তু থামিনি। আমাদের সাহস নাম হয়ে থাকবে।"
একটি ছাত্র আন্দোলন যদি না-ও বদলায় পুরো ব্যবস্থাকে, তবুও তা বদলায় ইতিহাস লেখার কালি। কিছু নাম থাকে না পাঠ্যবইয়ে, কিন্তু ভবিষ্যতের ছাত্রের মাথায় গেঁথে যায়-
> "তারা পড়ে না। তারা জেগে থাকে।"

ডাক্তার মানেই মানুষ, দেবতা নন

- নাইমুল ইসলাম রিহাত
এমবিবিএস, নবম ব্যাচ

"ডাক্তার তো মানুষ না, দেবতা"-এই বাক্যটি আমরা প্রায়শই শুনি। সামাজিকভাবে চিকিৎসকদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থার বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই হয়তো এটি বলা হয়। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। এক নিঃশ্বাসে বলা এই শ্রদ্ধার পেছনে যে কতটা অমানবিক প্রত্যাশা লুকিয়ে থাকে, তা আমরা অনেক সময় খেয়াল করি না।

চিকিৎসক হওয়ার পথটি শুধু কঠিন নয়, অনেক সময় তা হয় যন্ত্রণাদায়কও। একদিকে বছরের পর বছর অধ্যয়ন, ক্লাস, ক্লিনিক্যাল ডিউটি, অপরদিকে রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে রোগীর জীবন বাঁচানোর চেষ্টা-সব মিলিয়ে এই পেশার মানুষগুলো নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েই অন্যদের সুস্থ রাখার শপথে অটল থাকেন। একজন ইন্টার্ন চিকিৎসক মাঝরাতে কয়েকটি ডিউটির পর ক্লান্ত দেহে আবার নতুন রোগী সামলান-এই দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে না। এমবিবিএস পাশ করার আগ পর্যন্ত ৫-৬ বছর, এরপর পিজিটি, পোস্টগ্র্যাজুয়েট পড়াশোনা, গবেষণা, ট্রেনিং-এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে দিতে একজন চিকিৎসক জীবনের অনেক আনন্দ বিসর্জন দেন। তবুও তিনি চেষ্টার কমতি রাখেন না। কিন্তু তারপরও, একটি ভুল সিদ্ধান্ত কিংবা অনিবার্য মৃত্যুর দায় সরাসরি চিকিৎসকের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা আজও রয়ে গেছে।

আমরা ভুলে যাই-চিকিৎসকও একজন মানুষ। তাঁরও আবেগ আছে, পরিবার আছে, ক্লান্তি আছে। হাসপাতালের টানা ২৪ ঘণ্টার ডিউটি শেষে বাড়ি ফেরার সময় যদি তাঁর পথ আটকে প্রশ্ন তোলা হয়-"আপনি ঠিকমতো দেখলেন না কেন? তাহলে সেই মানুষটার ভেতরে কী ধসে পড়ে, তা কেউ দেখে না।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চিকিৎসকেরা অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করেন। বিশেষত উন্নয়নশীল দেশের বাস্তবতায় যেখানে একজন চিকিৎসককে সীমিত সরঞ্জাম, ঘন রোগীর চাপ ও প্রশাসনিক দুর্বলতার মধ্য দিয়ে কাজ করতে হয়, সেখানে তাঁর প্রতি সহনশীলতা ও সহযোগিতার মনোভাব অত্যন্ত জরুরি। ভুল হতেই পারে, কিন্তু সেই ভুল যদি ইচ্ছাকৃত না হয়, তবে তাতে সহমর্মিতা দেখানো আমাদের মানবিক দায়িত্ব। কিন্তু, এতদস্বত্তেও এদেশের বাস্তবতা হলো-"আমার রোগীর ডায়রিয়া হয়েছে কলেরা স্যালাইন কেন দিলেন? অথবা, ডাক্তার বুক চেপে (CPR) আমার রোগী মেরে ফেলেছে।"এরকম হাজারো অভিযোগ। যার ফলাফল- "ডাক্তার কেন কসাই"

তবে, এই আলোচনার মধ্যেও একটুও অস্বীকার করা যাবে না যে-চিকিৎসকের পেশাগত দায়িত্ব অত্যন্ত জবাবদিহিমূলক। চিকিৎসকের প্রতিটি সিদ্ধান্ত হতে হবে বিবেচনা ও জ্ঞানের ভিত্তিতে। কারণ তাঁর হাতে মানুষের জীবন। তবে সেটা বোঝার মানে এই নয় যে আমরা তাঁদের দেবতার আসনে বসাবো, এবং পরে সেই মূর্তিকে ভেঙে ফেলবো একটি ত্রুটির কারণে।

ডাক্তার মানেই মানুষ-ভুল করার অধিকার যাঁর আছে, তবে সেই ভুল শুধরে নিয়ে আরও ভালো করার সুযোগও তাঁর প্রাপ্য। শ্রদ্ধা যেন দায়িত্বকে বোঝায়, নিঃস্বার্থ ভালোবাসার আহ্বান জানায়, কিন্তু কোনো অমানবিক প্রত্যাশার ভার চাপিয়ে না দেয়-এই হোক আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।

যেভাবে জুলাই এলো

- জান্নাতুল ফেরদৌস ঈশি
এমবিবিএস ৯ম ব্যাচ, রোল: ৫০

২০২৪ সালের জুলাই ছিল বাংলাদেশে একটি রাজনৈতিক ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ, যেখানে কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমে রূপ নেয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিতে পূর্ণাঙ্গ গণঅভ্যুত্থানে। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ২০১৮ সালের সরকারি চাকরিতে কোটা বাতিলের সার্কুলার পুনর্বহাল করলে, ২০২৪ সালের জুনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে শুরু হয় কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন। এই আন্দোলন দ্রুতই সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং সরকারের দমন-পীড়নের মুখে আরও বেগবান হয়। জুলাই মাসের শেষের দিকে সরকার রক্তক্ষয়ী হামলা চালায়, যা 'জুলাই গণহত্যা' নামে পরিচিত। এই হত্যাযজ্ঞের পর আন্দোলনটি এক ভয়াবহ মোড় নেয় এবং দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে অসহযোগ ও বিক্ষোভের ঢেউ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতা হারিয়ে ভারতে পালিয়ে যান।

তার পদত্যাগের পর নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনুসকে প্রধান উপদেষ্টা এবং তার অধীনে গঠিত হয় একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, যার মাধ্যমে নতুন রাজনৈতিক যাত্রার ভিত্তি নির্মিত হয়। শুরু হয় বাংলাদেশের রাজনীতির নতুন অধ্যায়।

কোটা সংস্কার আন্দোলন:

২০১৮ সালে বাংলাদেশের সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে একটি গণআন্দোলনের সূচনা হয়, যার নেতৃত্ব দেয় "সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ"। দীর্ঘদিনের এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের লাগাতার চাপ ও গণদাবির মুখে সরকার শেষমেশ ৪৬ বছরের পুরনো কোটা ব্যবস্থা বাতিলের ঘোষণা দেয়।

২০১৪ সালের ৫ জুন হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ কোটা বাতিলের সিদ্ধান্তকে অবৈধ ঘোষণা করে। রায় ঘোষণার পরপরই দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং এই আন্দোলন নতুন করে উত্তাল হয়ে ওঠে।

জুলাই মাসে আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করে। "বাংলা অবরোধ" কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা রাস্তা অবরোধসহ নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। পুলিশের দমন-পীড়ন এবং অতিরিক্ত বলপ্রয়োগে রংপুর আবু সাঈদ নামক এক শিক্ষার্থী পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। এই মৃত্যুর ঘটনায় আন্দোলন আরও উত্তাল হয়ে ওঠে এবং দেশব্যাপী উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

পরবর্তীতে আন্দোলন ঢাকা ও অন্যান্য শহরে সহিংস রূপ নেয়। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, ছাত্রলীগ এবং যুবলীগের হামলায় বহু শিক্ষার্থী আহত ও নিখোঁজ হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার দেশব্যাপী কারফিউ জারি করে এবং ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

১৪ জুলাই, একটি সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোটা আন্দোলন নিয়ে বলেন, "যদি মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-নাতনিরা কোটার সুবিধা না পান, তাহলে কি রাজাকারদের নাতি-নাতনিরা পাবে?" তাঁর এই মন্তব্য আন্দোলনকারীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ১৫ জুলাই সকাল থেকেই শিক্ষার্থীরা স্লোগান তোলে:

"তুমি কে? আমি কে? রাজাকার, রাজাকার! কে বলেছে? কে বলেছে? স্বৈরাচার, স্বৈরাচার!"

১৬ জুলাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও আন্দোলনে যোগ দিলে তা "বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন" রূপে আরও বিস্তৃত হয়। সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ওই দিনই দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

বন্ধ ঘোষণা করে এবং ১৭ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্রাবাস খালি করার নির্দেশ দেয়।

সহিংসতা ও প্রাণহানি:

২০২৪ সালের আগস্টের শুরুর দিকে, চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা ভয়াবহ সহিংসতায় রূপ নেয়। পুলিশ ও ছাত্রলীগের যৌথ হামলায় হাজারো মানুষ প্রাণ হারায়, যাদের মধ্যে শিশুরাও ছিল। আন্দোলনের শহীদদের মধ্যে আবু সাঈদ, মীর মুগ্ধ, গোলাম নাফিজ, শাহারিয়ার খান আনাস সহ ছাত্রজনতার মৃত্যু জাতীর বিবেককে গভীরভাবে নাড়া দেয়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ, উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম আগস্ট মাসে জানান, বিদ্রোহ ও সহিংসতায় মোট নিহতের সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়েছে এবং চার শতাধিক শিক্ষার্থী দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। এছাড়াও সারাদেশে প্রায় ২০,০০০ জন আহত হন এবং ১১,০০০-এরও বেশি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ জানায়, নিহতদের মধ্যে অন্তত ৩২ জন ছিল শিশু।

পরবর্তীতে, ২০২৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনারের দপ্তর ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনার উপর একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। উক্ত প্রতিবেদনে মৃতের সংখ্যা ১,৪০০ বলে উল্লেখ করা হয়।

গণ আন্দোলনের চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ও এক দফা:

২০২৪ সালের ৪ আগস্ট, হাজার হাজার বিক্ষোভকারী ঢাকার শাহবাগ মোড়ে জড়ো হয়ে সরকারের পদত্যাগের দাবিতে অবরোধ কর্মসূচি শুরু করেন। এটি ছিল নাগরিক অবাধ্যতার একটি সুসংগঠিত রূপ, যেখানে দেশের সকল শ্রেণির মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। শহরের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিবাদী গ্রাফিতি আঁকা হয়, যা আন্দোলনের রাজনৈতিক বার্তা আরও স্পষ্ট করে তোলে। দমন-পীড়নের মুখে আন্দোলনকারীরা সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবি ঘোষণা করে। "এক দফা, এক দাবি; শেখ হাসিনার পদত্যাগ" স্লোগানে রাজপথ কম্পিত হয়। ৫ আগস্ট "ঢাকা অভিমুখে পদযাত্রা"-র সময় সংঘর্ষ আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। এই সময় অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তারাও রাস্তায় নেমে সেনাবাহিনীর নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখার আহ্বান জানান, যা আন্দোলনের রাজনৈতিক গুরুত্ব ও গভীরতা আরও বাড়িয়ে তোলে।

সরকার পতন:

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট, শেখ হাসিনাকে পদত্যাগের জন্য চাপ দেওয়ার জন্য দেশব্যাপী কারফিউ অমান্য করে বিক্ষোভকারীরা ঢাকায় লং মার্চের ডাক দেয়। বিক্ষোভকারীদের বিশাল জনতা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ঘিরে ফেললে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান শেখ হাসিনার পদত্যাগের ঘোষণা দেন। শেখ হাসিনা, তার বোন শেখ রেহানা সহ, ৫ আগস্ট ২০২৪ সালে সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন:

শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে ঘোষণা করেন যে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ এবং নির্বাচন আয়োজনের উদ্দেশ্যে একট অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হবে। ৬ আগস্ট, পূর্ববর্তী সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়। ছাত্র ও নাগরিক সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর পারস্পরিক ঐক্যমত্যে নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুসকে এই সরকারের নেতৃত্বে নিযুক্ত করা হয়।

৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে, ড. মুহাম্মদ ইউনূস ঢাকার বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

বিজয় উল্লাস:

হাসিনার পদত্যাগকে দেশজুড়ে জনসাধারণ এক ঐতিহাসিক বিজয় হিসেবে দেখেছিল। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বানে শুরু হওয়া এই গণআন্দোলনের সফল পরিণতি জনগণের মধ্যে উদ্দীপনা ও উৎসবের আবহ সৃষ্টি করে। এই বিজয় উল্লাস নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তার মধ্যে ছিলো-

* গণজমায়েত ও মিছিল: দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-জনতা থেকে শুরু করে জন সাধারণ সকলেই বিজয় মিছিল ও সমাবেশের মাধ্যমে আন্দোলনের সফলতা উদযাপন করে। স্বৈরাচার সরকারের বিরুদ্ধে এই বিজয়কে "স্বাধীন বাংলাদেশ-২ " হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।
* সাংস্কৃতিক আয়োজন: নাটিকা, গান, কবিতা আবৃত্তি, আন্দোলনের ভিডিও ফুটেজ দিয়ে তৈরি ডকুমেন্টারি জনসমাবেশে পরিবেশনার মাধ্যমে এই ঐতিহাসিক বিজয় উদযাপন করা হয়।
* দেয়াল লিখন ও চিত্রাঙ্কন: শহরের দেয়ালজুড়ে আন্দোলনের প্রতীকী ছবি ও স্লোগান অঙ্কিত হতে থাকে, যা বিপ্লবের চেতনাকে জীবন্ত করে তোলে।

শেষ কথা:

২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলন ছিল শুধু একটি কোটা সংস্কার আন্দোলন নয়; এটি ছিল একটি বঞ্চিত জাতির সম্মিলিত প্রতিবাদ এবং স্বাধীন চিন্তার অধিকার রক্ষার এক ঐতিহাসিক অধ্যায়। এই আন্দোলনে তরুণ প্রজন্মের সাহস, জনগণের প্রতিরোধ এবং শহীদদের আত্মত্যাগ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়-বিচারহীনতা, বৈষম্য ও স্বৈরতন্ত্র কখনো দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। জুলাই আন্দোলন আমাদের শিখিয়ে দেয়, যখন জনগণ জেগে ওঠে, তখন কোনো শক্তিই তাদের দাবিকে দমন করতে পারে না।

ভিন্ন চিন্তা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে

- মোহাম্মদ আলমগীর
ব্যাচ-১০ম, রোল-০৬

যদি প্রশ্ন করি,
জীবনের লক্ষ্য কি?
জন্ম থেকে মৃত্যু এই মাঝখানের জীবনের
উদেশ্য কি?
যদি ভাবতে থাকি !!!
কোন গন্তব্যে হেঁটে এই ঠুনকো জীবনকে
কোন গন্তব্যে নিবো।
অন্ধকার নাকি আলো

ব্যক্তির এই ঠুনকো জীবন হচ্ছে অন্ধকার এবং আলোর সমষ্টি। এই ঠুনকো জীবন, ইহকাল, পার্থিব এক জগতেরই কত ভিন্ন ভিন্ন নাম। সে ভিন্ন জীবন ভিন্ন নামই বলা হউক না কেন এর স্বরূপ কিচ্ছু বদলায় না।

এই ঠুনকো জীবনের অন্ধকার আমাদের পরকালের চিন্তা কে ভুলিয়ে রাখে। অথচ পরকাল এক পরম সত্য। যে সত্যের সম্মুখীন একদিন তুমি আমি সবাই হবো।

এই দুনিয়ার অনধকার মিছে মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে ভুলে যায় পরম সত্যকে। কত বিবেকহীন আমরা।

আর পার্থিব জীবনের স্বরূপ ও প্রকৃতি বর্ণনা করে আমার রব বলেন

"এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু। জেনে রেখো আখিরাত হলো চিরস্থায়ী আবাস।
[সুরা গাফির, আয়াত ৩৯]

আর যুগে যুগে এই আখিরাত বিমুখ পথভ্রষ্ট জাতিকে দ্বীনের পথে ফেরানোর জন্য আল্লাহ তায়লা বহু নবী-রাসুল প্রেরণ করেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর পর আর কোন নবী-রাসূল আসে নাই।

আর এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আমার রব বলেন:
আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলাম কে তোমাদের দ্বীন হিসাবে পছন্দ করলাম"
[সুরা আল মায়িদা ৫, ৩]

নবী রাসূল ছাড়া ও এ পথভ্রষ্ট উম্মাহ'র জন্য পৃথিবী আল্লাহ পাঠিয়েছে অগণিত সূর্য মানব।

আর আজকে আলোচনা করবো সে এক অনন্য সূর্য মানবের মেডিকেল জীবন নিয়ে।

আর হ্যাঁ, মানুষ মাত্রই ভুল। তাই লেখার কোন অংশে ভুল পরিলক্ষিত হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দেখবেন।

চলেন শুরু করি, ভিন্ন চিন্তার ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

আমরা সবাই জানি, ডা. জাকির নায়েক মুসলিম উম্মাহ'র একজন কিংবদন্তি। ভদ্রলোক ভারতের-মুম্বাই শহরে Topiwala National Medical college and BYL Nair charitable Hospital - এ চিকিৎসা শিক্ষা গ্রহণ করেন। মজার বিষয় হচ্ছে ভদ্রলোক মেডিকেলে পড়ার সময় বন্ধু ও ডাক্তার শিক্ষকদের ইসলামের দাওয়াত দিতেন।

কলেজে চিন্তার বিষয়, আমিও মেডিকেল ছাত্র, চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেলে পড়ি। আমার অধিকাংশ বন্ধু ও স্যার মুসলিম। কিনতু ভদ্রলোক জাকির নায়েক সাহেবের অধিকাংশ বন্ধু ও ডাক্তার শিক্ষকরা ছিলেন অমুসলিম।

মজার বিষয় হচ্ছে, মেডিকেল ভাইভার অর্ধেক মার্ক ছিলো শিক্ষকদের হাতে। লিখিত পরীক্ষার নম্বর নিজের হাতে থাকলে ও ভাইভার নম্বর থাকতো সম্পূর্ণ অমুসলিম ডাক্তার শিক্ষকদের হাতে।

আর এদিকে দিনের পর দিন ভদ্রলোক জাকির নায়েকের দুঃসাহসিক কাজের পরিধি বাড়তেছে।

বন্ধু থেকে শিক্ষক প্রত্যেকের কর্ণকুহরে পৌঁছাতে শুরু করলো ইসলামের দাওয়াত।

আর দুঃসাহসিক কাজের এক পর্যায়ে তার বন্ধুরা তাকে বললো, তুমি যে ভীষণ দুঃসাহসিক কাজ করতেছো, অমুসলিম ডাক্তার শিক্ষকদের ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছো তারা যদি তোমাকে নম্বর না দেয় ভাইভাতে। পরীক্ষায় ফেইল করিয়ে দেয়। তাহলে তুমি তো পরের ক্লাসে উঠতে পারবে না "

ফেইল শব্দটি শোনার সাথে সাথে আপনি এবং আমার চিন্তা বা অনুভূতি কেমন ছিলো।

চিন্তা বা ভাবুন তো, একবার, দুইবার, তিনবার চিন্তা করুন ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে।

অথচ ডাক্তার জাকির নায়েক বন্ধুদের জবাবে বললেন "যদি শিক্ষকরা ভাইভাতে আমাকে ফেইল করায়, আমি যদি উত্তীর্ণ হতে না পারি, তাহলে তো আমি আরেকটা বছর তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতো পারবো।

শিক্ষা

আমরা ও তো মেডিকেল ছাত্র। আমাদের সকলের জীবনের উদ্দেশ্য তো তার মতো হতে পারতো।

অথচ টাকা ও নারী দুটোকে লক্ষ্য বানিয়ে আমরা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য) ভুলে গেছি।

মেডিকেল শিক্ষা জীবনে দ্বীনের দাওয়াতকে আমরা আনন্দ হিসাবে নিতে পারতেছিনা।

রিজিকের অযুহাতে এই ঠুনকো জীবনের অনধকার কে সামনে রেখে ছুটে চলতেছি অবিরাম গন্তব্যহীন পথভ্রষ্ট পথে।

আর আমার রব রিজিক সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলেনঃ তারা কি জানে না আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রিজিক প্রশস্ত করেন এবং সংকুচিত করেন।

[সুরা যুমার ৩৯:৫২]

এজন্য আমরা প্রত্যেক মুসলিম ছাত্রদের মেডিকেল জীবন হতে হবে ইসলাম বান্ধব। দাওয়াত হতে হবে আমাদের লক্ষ্য ও উদেশ্য। হয়তো আল্লাহ যদি চান আমাদেরকেও সম্মানিত করতে পাবেন ভদ্রলোক জাকের নায়েকের মতো।

তিনি তো বলেন,

যে ব্যক্তি একটি ভালো কাজ নিয়ে আসবে তার জন্য থাকবে দশগুণ পুরস্কার। [সুরা আনআম ৬: ১৬০]

আল্লাহ আমার সকল ব্যাচমেট, সিনিয়র, জুনিয়র কে দ্বীনের পথে কবুল করুক।

অজ্ঞতার অন্ধ উপাসনা

- কাজী মোঃ মুয়াজ
এমবিবিএস, ১০ম ব্যাচ

বুদ্ধিহীন জনগোষ্ঠীর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো অন্ধ অনুসরণ। সম্ভবত প্রাচিনকালে শিকারে যাওয়ার সময় দলনেতার পেছনে অন্ধভাবে হেটে চলা অলস মস্তিষ্কের সেই লোক গুলোর জিনগত বৈশিষ্ট্যটা কালকর্মে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস যুক্তি ও কল্পনার দ্বন্দ্বে গঠিত। কল্পনা দিয়েছে দেবতা, পরকাল, অলৌকিকতার আশ্রয়-আর যুক্তি দিয়েছে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও মানবতাবাদ। কিন্তু যখন বিশ্বাস যুক্তিকে একেবারে উপেক্ষা করে, জন্ম নেয় গোঁড়ামি। এটি হলো এমন এক মানসিক অবস্থা, যেখানে মানুষ নিজের ধারণাকে চূড়ান্ত বলে ধরে নেয় এবং অন্য মত, প্রশ্ন বা প্রগতিকে শত্রু হিসেবে দেখে।

অনুসরণপ্রেমী অলস মস্তিষ্ক, আর তথাকথিত আত্মকেন্দ্রিক অহংবোধ থেকেই জন্ম নেয় গোঁড়ামিগোঁড়ামি মানে হলো এমন এক মনের বন্ধন, যেখানে বিশ্বাস এতটাই কঠিন হয়ে ওঠে যে তাতে যুক্তি, বাস্তবতা কিংবা সহনশীলতা ঠাঁই পায় না। এটা ধর্মীয় হতে পারে, রাজনৈতিক হতে পারে, এমনকি সামাজিক রীতিনীতির ক্ষেত্রেও হতে পারে। গোঁড় মানুষ নতুন প্রশ্নকে ভয় পায়, কারণ প্রতিটি প্রশ্ন তার বিশ্বাসের ভিত কাঁপিয়ে তোলে।

"The fundamental cause of the trouble is that in the modern world the stupid are cocksure while the intelligent are full of doubt." -Bertrand Russell

বাংলাদেশের ইতিহাসে আমরা একাধিকবার গোঁড়ামির ভয়াবহ রূপ দেখেছি। নারী শিক্ষা যখন প্রবর্তিত হয়, তখন বলা হয়েছিল-মেয়েরা বই পড়লে চরিত্র নষ্ট হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চাকে একসময় ধর্মবিরোধী আচরন বলে অভিহিত করা হতো। আজও অনেক গ্রামে স্বাস্থ্যসেবা, টিকা, কিংবা রক্তদান নিয়ে ভয়ভীতি ছড়ানো হয় কেবল গোঁড় ধারনার কারণে।

বিশ্বজুড়ে গোঁড়ামির ইতিহাস বেশ পুরোনো মধ্যযুগে ইউরোপে "উইচ হান্ট" নামে এক প্রথা প্রচলিত ছিল। যেখানে নারী দের "উইচ" তথা ডাইনি বলে পুড়িয়ে মারা হত প্রকৃতপক্ষে, তারা ছিলেন চিকিৎসক, ধাত্রী, বা সমাজে স্বতন্ত্র চিন্তাশীল মানুষ।

গোঁড়ামির সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হলো, এটি মানুষের আত্মসমালোচনার ক্ষমতাকে নিস্তেজ করে দেয়। গোঁড়া মানুষ কখনোই নিজের ভুল খুঁজতে চায় না, বরং প্রতিপক্ষকে দোষারোপে ব্যস্ত থাকে। গোঁড়ামি ধর্মীয় হতে পারে-যেখানে একমাত্র নিজের ধর্মকেই সত্য বলে মনে করা হয় এবং অন্য ধর্মকে ঘৃণা করা হয়। আবার একই ধর্মের মধ্যে রয়েছে আবার নানান দল। নানান দলের আবার নানান মতবাদ। আবার সেই মতবাদের বিরোধীদের জন্য রয়েছে বিস্তর ঘৃণা। এ যেন ঘৃণা উৎপাদন কারখানা। যে দল তার বিরোধী দলের বিপক্ষে ঘৃণা প্রদর্শন করবে সে তত বেশি তার দলের প্রতি বিশ্বস্ত ও কর্তব্যনিষ্ঠ। তাদের ঘৃনা এমন যে তারা মানুষই নয়। তাঁদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই। কেন নেই? কারণ তাদের পীরের দীক্ষা বাদে পৃথিবীর বাকিসব জ্ঞান ও চিন্তা ভাবনা মিথ্যা।

গোঁড়ামি আবার রাজনৈতিকও হতে পারে-যেখানে একটি দলের চিন্তাকেই 'জাতির স্বার্থ' বলে চালানো হয়।

ধর্মীয় গোঁড়ামির উৎস অন্ধ অনুসরণ ও জ্ঞানের তুলনায় আবেগের প্রাচুর্য। আর রাজনৈতিক অথবা জীবনের দর্শনে যে গোঁড়ামির সৃষ্টি সেটি পারিপার্শ্বিক ও নিরপেক্ষ চিন্তা থেকে প্রজন্মকে দূরে ঠেলে দেয়ার মনমানসিকতা। এর পেছনে শুধু যে জাতিগত সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য দায়ি নয়। সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা ও তরুন সমাজ ও পরিবারিক ক্যারিয়ার চিন্তাও অনেক ক্ষেত্রে জড়িত। যখন একটা জাতি জীবিকার তাগিদে তথাকথিত পাঠ্যপুস্তক, ডিগ্রি চাকরির ইঁদুর দৌঁড়ে পড়ে যায়। তাও এমন এক দেশে যেখানে জনসংখ্যা এত বেশি যে সব তরুণদেরকে নিশ্চিত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। জীবন সংগ্রামের রোষানলে পড়ে যাওয়া জাতির কখনোই চিন্তা ভাবনা করার সময় পায় না। তাদের বাবা মা ও পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বই পড়া, নতুন জ্ঞান চর্চার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে না।

একটি জাতিকে পুরোপুরি ধ্বংস করতে প্রয়োজন ঐ জাতির গোটা প্রজন্মকে সত্য বিমুখ করে রাখা। তাদের অন্তরে কিছু ভ্রান্ত বিশ্বাস ঢুকিয়ে আজীবন গোঁড়ামির কারাগারে বন্দি করে রাখা। সম্ভবত বৃটিশ সাহেবগণ এই উপমহাদেশের মানুষকে জ্ঞায় বিমুখ করে শিক্ষিত শ্রমিক উৎপাদনের লক্ষ্যে এমন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ঘটিয়েছিল।

Voltaire বলেছিলেন:

"Those who can make you believe absurdities, can make you commit atrocities."

গোঁড়ামি ও পক্ষপাতিত্ব বিষয়টি এমন নয় যে কেউ নিজ থেকে শিখে। পরিবার সমাজের সামগ্রিক মনমানসিকতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে। সদ্য বেড়ে উঠা শিশুদের এই মহামারি থেকে রক্ষা করা কঠিন। চারপাশের মানুষের নিচু মনমানসিকতার রোষানলে পড়ে জন্ম নেয় আরেকটি গোঁড়া প্রজন্ম।

সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি নিরপেক্ষ চিন্তাভাবনা, জ্ঞানের প্রসার পক্ষপাতিত্বতা ও সেটি থেকে মুক্তির শিক্ষা প্রদান এখন অতিব জরুরি, পাশাপাশি পারিবারিক পর্যায়ে মূল্যবোধ আত্মসমালোচনাকে শানিত করা প্রয়োজন। বর্তমানে সামাজিক মাধ্যম, গোষ্ঠীগত মেরুকরণ ও ভুল তথ্যের বন্যায় গোঁড়ামি ও পক্ষপাতিত্ব যেন আরও তীব্র হচ্ছে। এই সময়ে প্রয়োজন মুক্তচিন্তার সাহসী কণ্ঠ, যারা ভাববে, প্রশ্ন করবে, যুক্তি করবে এবং শ্রদ্ধাবোধ বজায় রেখে মতপ্রকাশ করবে।

লেখক ইমানুয়েল কান্ট তার লেখা বই "What is Enlightenment?" এ বলেন,

"Enlightenment is man's emergence from his self-imposed immaturity."
"Dare to know! (Sapere aude)"

যেখানে মানুষ বনসাই হয়ে বাড়ে

- কাজী মোঃ মুয়াজ
এমবিবিএস, ১০ম ব্যাচ

"এখানে আকাশ কবিতা গল্পে লেখা
ফুল পাখিদের রঙ পেনসিলে আঁকে
এক দুই তিন সংখ্যারা এখানেই
জীবনের মানে ভিষন মিথ্যে রাখে"

হ্যাঁ হয়তো বা তাই। স্বরব্যাঞ্জোর এই কয়েকটা লাইন আমায় টেনেছিল ভীষনভাবে। মধ্যবেঞ্চির ছাত্র হয়েও শেষ বেঞ্চির ছেলেটির কল্পনার জগতে নিজেকে ভীষন রকম প্রাসংগিক মনে হচ্ছিলো। রঙ পেনসিল আর সংখ্যার যান্ত্রিকতার যে বিতর্ক সেটাকে অন্যেরা উড়িয়ে দিতে চাইলেও আমার দ্বারা বোধহয় হলো না। তবে লিউনার্দো দ্যা ভিঞ্চির মত প্রতিভাবান মনের অধিকারি মানুষ গুলো হয়তো রঙ পেনসিলের মাঝেও এক দুই তিন সংখ্যা খুঁজে পেতে পারেন তাতে আমার অভিযোগ নেই। মানবজাতিকে ধন্যবাদ যে তারা সৌন্দর্যকে কোনো সংজ্ঞায় অধিভুক্ত করে নি। তাই আজ এই সংজ্ঞাহীনতাকে সৌন্দর্যের সৌন্দর্য হিসেবে চালিয়ে দেয়া যাচ্ছে সহজেই। আর এরই ধারাবাহিকতায় বোধয় গনিতের কল্পনার ঘোর কেটে জন্ম হয়েছিল শ্রীনিবাস ও আর্যভট্টদের মত সংখ্যাপ্রিয় মানুষের। অপরদিকে আইনস্টাইনের মত কল্পনাবিলাসী মানুষ। যে কিনা বলেছিলেন "Imagination is more powerful than knowledge" তিনিই কিনা জীবনের প্রায় সবটুকু ঢেলে দিয়ে বুঁদ হয়েছিলেন ইন্টিগ্রেশন ডিফারেন্সিয়াশন ও ফিল্ড ইকুয়েশনের ধাঁধায়।

তবে আমার কাছে সংখ্যার যান্ত্রিকতা কল্পনার রঙিন জগতে ভীষন অপ্রাসঙ্গিক। নাহয় প্রিয় রঙ নীল কে নীলের বদলে ৪৫০ ন্যানোমিটারের তরঙ্গ হিসেবে দেখতাম। ভোরের কিচির মিচির ও পাতার মর্মর ধ্বনিকেও ২০ ডেসিবেল এর শব্দ হিসেবে শুনতাম। যে শব্দহীনতা আমার মাঝে নিরবতার গভিরতা উপলব্ধি করিয়ে ছিল সেই শব্দহীনতা তে বিজ্ঞান ডেসিবেল বসিয়ে দিলো। যেখানে মানুষের ভিন্ন মতাদর্শ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছিল। সেখানে এসে জায়গা করে নিলো বাইনারি ও লজিক গেইট। ০ আর ১ মাঝেও যে অসংখ্য সংখ্যা বিদ্যমান সেগুলো এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

আচ্ছা জীবন কি সবসময় সংখ্যার নিয়মে চলে?

সংখ্যার নিয়মের অন্তর্ভুক্ত সমীকরন গুলোর ও একসময় সমাধান বের হয়। তাহলে জীবন সমীকরনের সমাধান কি?

প্রশ্নগুলো হয়তো একটু আধ্যাত্মিক হয়ে গেল। এই প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই। শুধু আমার কেন। কারো কাছেই হয়তো নেই।

ছন্দ কবিতা ও রঙ পেনসিল দিয়ে যে জীবন শুরু করেছিলাম। সে জীবন এখন রসায়নের ঝাঁঝালো বিক্রিয়ায় এসে থেমেছে। রঙ পেনসিলের জগৎটার উপর স্টিম রোলার চালিয়ে গেল সাইন থেটা কস থেটা ও ডি ডি এক্স এর মেশিন।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচার যেন উপায় নেই। মানুষের জীবনের অসম্ভব ভুল যেটা তাকে করতেই হয় সেটা হলো বড় হওয়া। এই জগতের শুরু হয় সংখ্যা দিয়ে। শেষ হয় পাওয়া না পাওয়ার হিসেব দিয়ে। ছোটবেলার যে সন্ধ্যা শুরু হত কাজলা দিদি হারিয়ে যাওয়ার গল্প হতে। সে সন্ধ্যা এখন নামে এক রাশ দীর্ঘশ্বাস দিয়ে। কখনো সব ফেলে ছুটে যাওয়ার সুযোগ পেলে হয়তো ছুটে যেতাম। যান্ত্রিকতার জেলখানা থেকে পালাতে পারলেই যেন বাঁচি।

বিজ্ঞান ও সংখ্যার হয়তো আলাদা সৌন্দর্য আছে। তাই প্রাচীনকাল থেকে বহু কিংবদন্তি এই রহস্যময় জগতে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন।

সংখ্যা ও বিজ্ঞানের সে সৌন্দর্য হয়তো আমি উপলব্ধি করতে পারি নি। তাই মনের এক কোনায় বোধহয় জন্মেছিল গভীর ক্ষোভ আর আত্মগ্লানি। সেই ক্ষোভ থেকেই হয়ত এই লেখা।

কেউ সংখ্যায় খুঁজে পায় শান্তি কেউ বা খুঁজে পায় লক্ষিপেঁচা, অশত্থ ও সুদর্শনের পালে। কেউ বা শিল্পির রঙ তুলি ও সুমধুর সুরে। আর কেউ কবিতার ছন্দে।

বিজ্ঞজন ও গুরুজনদের নানা মত থাকতে পারে। সবাই নিজ নিজ জগতের রাজা। সে জগতে সবাই বিজ্ঞ।

আমার জগতের হালকা আলো নাহয় ফেললাম এই সাদা পৃষ্ঠায়। ক্ষতি কি।

"জীবন তাদের কাছে মজাদার যারা চিন্তা করে এবং তাদের কাছে যন্ত্রনার যারা অনুভব করে" -Horace walpole

পুনশ্চ: লেখাটি যখন লিখেছি স্কুল কলেজের মধ্যবেঞ্চির ছাত্র ছিলাম আর এখন মেডিকেল কলেজের শেষ বেঞ্চিই আমার ঠাঁই। তাই শেষ বেঞ্চির ছেলেটার জীবনটাও আমার সাথে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক।

শত অবহেলা, শত আড়ালে নিভৃতের এক কল্পনার মহাকাব্যের সেই শেষ বেঞ্চি যেখানে মানুষ বাড়ে বনসাই হয়ে, যেখানে আকাশ মহাশূন্যেরও দূরে..। সেই শেষ বেঞ্চ হতে...

জুলাই বিপ্লব ও বিপ্লব পরবর্তী আমার কিছু ভাবনা...

- মুহাম্মদ আমিমুল ইহসান (ইসমাম)
এম.বি.বি.এস দ্বিতীয় বর্ষ (ব্যাচ-১১)

সরকারি চাকুরিতে কোটা বহাল ও বিগত সরকারের আমলে ঘটে যাওয়া নানা অসঙ্গতির প্রতিবাদে দেশের সর্বস্তরের জনগণের অসহযোগ আন্দোলনের এক অনন্য উদাহরণ হলো "২৪ এর গণঅভ্যুত্থান" তথা 'জুলাই বিপ্লব'। এটি একইসাথে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার বিলোপ এবং জণগণের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে একটি প্রভাবক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

জুলাই বিপ্লবের 'Unsung Heroes' তথা ডাক্তারদের কিছু ভুমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক এখন।

আহত বিপ্লবীদের সেবা দান:

জুলাই বিপ্লব চলাকালীন সারাদেশের হাসপাতালগুলোতে অসংখ্য আহত বিপ্লবী জনতাকে নিরবচ্ছিন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেছেন আমাদের ডাক্তার ভাই/বোনেরা। আমরা তাদের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

মেডিকেল কমিউনিটির আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা:

সারাদেশের সকল শিক্ষার্থীদের 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচির ডাকে একাত্মতা পোষণ করে ক্লাস বর্জন করে মেডিকেল কলেজের সকল শিক্ষার্থীগণ নেমে এসেছিলো রাজপথে। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়েছিলো ক্যাম্পাসগুলো। এ থেকে বুঝা যায় মেডিক্যালের ছাত্রছাত্রীরা শুধু বইয়ের পাতায় মুখ বুজে পড়ালেখা করতেই ব্যস্ত থাকেনা বরং রাষ্ট্রযন্ত্র সংস্কারের প্রয়োজনে রাজপথে নেমে আসতে তারা পিছপা হননা।

জনসচেতনতা সৃষ্টি:

জুলাই বিপ্লব সম্পর্কে মেডিকেল কমিউনিটির সকলের ভিতর আন্দোলনের উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলতে অনেক ডাক্তার ভাইয়া/আপুরা সামাজিক গণমাধ্যমে নিজেদের ক্ষতি হতে পারে এটা জানা সত্ত্বেও লেখালেখি চালিয়ে গিয়েছেন পুরো জুলাই মাস জুড়েই।

স্বাস্থ্যখাতে নানা অনিয়মের প্রতিবাদ:

বিগত সরকারের আমলে পুরো স্বাস্থ্যখাত জুড়ে ক্যান্সারের মতো বাসা বেধেছিল নানান দুর্নীতি। ডাক্তারগণ ফ্রন্টলাইনার হিসেবে চিকিৎসাসেবা দানের পাশাপাশি সেসব অনিয়ম তুলে ধরেছেন কখনো বা নিজেদের ফেসবুক ওয়ালে আবার কখনো বা বক্তব্যে।

জনমত গঠনে সরব উপস্থিতি:

ডাক্তারগণ মেডিকেল কমিউনিটির বাইরেও দেশব্যাপী জনমত গঠনে রেখেছেন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। যার ফলশ্রুতিতে আমরা পেয়েছি সিস্টেমের সমালোচনা করার অধিকার।

এখন আসি বিপ্লব পরবর্তী কেমন স্বাস্থ্যখাত চাই সে প্রসঙ্গে খানিকটা আলোকপাত প্রসঙ্গে।

বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি:

উন্নত দেশগুলোতে যেখানে জাতীয় বাজেটের ৫-৬% বরাদ্দ থাকে স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে সেখানে আমাদের দীর্ঘদিন ধরেই বরাদ্দ হয় বাজেটের ১-২%। মানবসম্পদ উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো নাগরিকদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা। সেক্ষেত্রে বিপ্লব পরবর্তী বাজেটে অবশ্যই বরাদ্দ বৃদ্ধি চাই এই খাতে।

ডাক্তারদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি ও কাজের সুষ্ঠ পরিবেশ নিশ্চিত করা:

আমরা বিভিন্ন সময়ে ইন্টার্ন ডাক্তারদের বেতন-ভাতা ও কর্মপরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত নানা যৌক্তিক আন্দোলনে তাদের মাঠে নামতে দেখেছি। এক্ষেত্রে আমার চাওয়া হলো সরকার যেন ডাক্তারদের যথাযথ সম্মানীপ্রাপ্তি নিশ্চিত ও সুষ্ঠ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করে ডাক্তারদের সেবা প্রদানের পথটি যেন আরো মসৃন করেন।

রোগীর অনুপাতে চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি:

এখনো দেশে সরকারি হাসপাতালগুলোতে প্রতি ১৫০০+ রোগির জন্য মাত্র একজন চিকিৎসক বরাদ্দ যেটা যথাযথ চিকিৎসা দানের ক্ষেত্রে ডাক্তারদের জন্য একটা পাহাড়সম বোঝা হয়ে দাড়ায়। অন্তর্বতীকালীন সরকারের উচিত রোগির অনুপাতে চিকিৎসকের সংখ্যা গুণগতভাবে বৃদ্ধি করা যাতে তারা দ্রুততম সময়ে রোগিদের চিকিৎসা সেবা দিতে পারেন।

অন্তর্ভুক্তিমূলক স্বাস্থ্যখাত সৃষ্টি:

নিম্নআয়ের ও সুবিধাবঞ্চিত অসংখ্য মানুষ চিকিৎসা সেবার ব্যয় বহন করতে না পেরে অনেক সময় বিনা চিকিৎসায় মারা যান। বিপ্লব পরবর্তী সরকারের কাছে আমাদের চাওয়া হলো একটা অন্তর্ভুক্তিমূলক স্বাস্থ্যখাত যেখানে কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে যেন চিকিৎসার খরচ নিয়ে চিন্তিত হতে না হয়।

উন্নত প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি:

ডাক্তারগণ যেন নিখুঁতভাবে রোগ শনাক্ত ও ডায়াগনোসিসে নিজেদেরকে আরো শানিত করে তুলতে পারেন সে লক্ষ্যে ডাক্তারদের জন্য নানান উচ্চতর প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি করা উচিত।

আন্তঃক্যাডার বৈষম্যরোধ:

বিসিএসের ক্ষেত্রে দেখা যায় অন্যান্য ক্যাডারদের তুলনায় স্বাস্থ্য ক্যাডারগণ খুবই কম সুযোগ-সুবিধা ও সামাজিক মর্যাদা পেয়ে থাকেন যেটা কোনোভাবেই কাম্য নয়। এক্ষেত্রে সরকার উচিত আন্তঃক্যাডার বৈষম্য রোধ কল্পে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ডাক্তারদের নিজের ফিল্ডে যেন আন্তরিকতা দিয়ে কাজ করে যাওয়ার মানসিকতা বজায় থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখা।

নিরাপত্তা সুবিধা বৃদ্ধি করা:

আমরা দেখেছি কিভাবে রোগীর আত্মীয়স্বজন অনেক সময় কর্তব্যরত চিকিৎসকের উপর হামলা সহ নানা ভাবে ডাক্তারদের হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে থাকে। এক্ষেত্রে আমাদের চাওয়া এমন একটা নিরাপদ কর্মপরিবেশের নিশ্চয়তা যেখানে এ ধরনের ঘটনা ঘটবে না।

পরিশেষে মেডিক্যাল ছাত্র হিসেবে জুলাই বিপ্লবকে মনেপ্রাণে ধারণ করার পাশাপাশি আমরা যেন সবাই মানবিক ডাক্তার হওয়ার অভিপ্রায়ে আমাদের লক্ষ্যে অটল থাকতে পারি এই কামনাই করছি।

অপারেশন আল আকসা ফ্লাডঃ আবু উবাইদার শ্রদ্ধাবনত স্বীকৃতি

- ইবতেসাম রিকি, ১১তম ব্যাচ

অক্টোবর ১৬, ২০২৪ ডেন্টাল প্রাঙ্গণে সন্ধ্যাবেলায় কাওয়ালি উৎসব চলছিল। বন্ধুদের সাহচর্যে সুরের মূর্ছনায় রসাস্বাদনে নিমগ্ন ছিলাম। হঠাৎ মোবাইল হস্তে ধারণ করে ফেসবুকে প্রবেশ করতেই দৃষ্টিগোচর হলো আসাদ ভাইয়ের এক শোকাবহ পোস্ট- একবিংশ শতাব্দীর সালাহউদ্দিন আইয়ুবী শহীদ হয়েছেন। মনোজগতে তাৎক্ষণিকভাবে শোকের ছায়া নেমে এলো। টেলিগ্রামের সংবাদ চ্যানেলসমূহে অনুসন্ধান চালালাম শহীদের দুটি আলোকচিত্র ইতোমধ্যে সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ইহুদিবাদী শক্তিসমূহ এখনো আনুষ্ঠানিক নিশ্চয়তা দেয়নি, তবে প্রতীয়মান যে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর শাহাদাত অবশ্যম্ভাবী। হামাস থেকেও কোনো সুস্পষ্ট বিবৃত্তি নেই। মধ্যপ্রাচ্যে বিরাজ করছে এক গভীর, গুমোট নিস্তব্ধতা।

কাওয়ালি প্রাঙ্গণ ত্যাগ করলাম সাম্প্রতিক প্রফুল্লতার প্রতিচ্ছবি মুহূর্তেই বিবর্ণ ও নিষ্প্রভ। কণ্ঠ নির্বাক, দৃষ্টিতে হতবিহ্বল বন্ধুদের প্রশ্ন কী ঘটেছে? উত্তরহীন আমি, নিঃসঙ্গভাবে কলেজের মাঠে গিয়ে আসীন হলাম। অন্তরে চলছিল ব্যথার অবিরাম তরঙ্গ। হঠাৎ মনে উদিত হলো কুরআনের শাশ্বত বাণীঃ "তোমরা শহীদদের মৃত মনে কোরো না..." হ্যাঁ, সত্যই তো। শহীদগণ তো পরমার্থে জীবিত, তাঁরা চূড়ান্ত সফল। অথচ আমরা? আমরা কেবল ফেসবুক পোস্টে নিঃশেষ হই, নিজেকে অবদমনের বিলাসে ফেলে দিই। এ তো এক প্রকার আত্মপরাজয়ের নিদর্শন, নতচিন্তার মর্মান্তিক প্রতিফলন।

ঘটনার প্রারম্ভ সকলেরই অবগত-৭ই অক্টোবর, সুবেহ সাদিকের পরপরই, হামাস তাদের সুনিপুণ ও বজ্রাহত আকস্মিক আঘাতে ইসরায়েলের আত্মম্ভরিতায় পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কাঠামোকে চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। শতাব্দীব্যাপী অপমান, নিপীড়ন ও রক্তক্ষয়ের প্রতিশোধে, মুসলিম উম্মাহর সম্মিলিত স্বপ্ন ও সাহসে, ঈমানের দুর্জয় শক্তিকে সম্বল করে, সংখ্যায় নগণ্য হলেও সে বাহিনী অদম্য বীরত্বে শত্রুর অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। কেউ প্যারাগ্লাইডারে যেন আবাবিলের ন্যায় আকাশ হতে নেমে আসে, কেউ বা স্থলভাগে সিংহসম বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ ছিল এক বিস্ময়কর ও ইতিহাসজয়ী জিহাদ, যা এই শতাব্দীর পবিত্রতম প্রতিরোধের সাক্ষ্য হয়ে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। হামাস এর নাম দেয়, "অপারেশন আল আকসা ফ্লাড"। শুরু হয় মধ্যে প্রাচ্যে নতুন মেরুকরণ।

ঘটনার প্রারম্ভ সকলেরই অবগত-৭ই অক্টোবর, সুবেহ সাদিকের পরপরই, হামাস তাদের সুনিপুণ ও বজ্রাহত আকস্মিক আঘাতে ইসরায়েলের আত্মম্ভরিতায় পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কাঠামোকে চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। শতাব্দীব্যাপী অপমান, নিপীড়ন ও রক্তক্ষয়ের প্রতিশোধে, মুসলিম উম্মাহর সম্মিলিত স্বপ্ন ও সাহসে, ঈমানের দুর্জয় শক্তিকে সম্বল করে, সংখ্যায় নগণ্য হলেও সে বাহিনী অদম্য বীরত্বে শত্রুর অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। কেউ প্যারাগ্লাইডারে যেন আবাবিলের ন্যায় আকাশ হতে নেমে আসে, কেউ বা স্থলভাগে সিংহসম বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ ছিল এক বিস্ময়কর ও ইতিহাসজয়ী জিহাদ, যা এই শতাব্দীর পবিত্রতম প্রতিরোধের সাক্ষ্য হয়ে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। হামাস এর নাম দেয়, "অপারেশন আল আকসা ফ্লাড"। শুরু হয় মধ্যে প্রাচ্যে নতুন মেরুকরণ।

১৫ জানুয়ারি ২০২৫-ইতিহাসের পাতায় খোদাই হওয়া এক গৌরবময় দিন। এই দিনেই দ্বিতীয় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়, যেটি হামাসের পক্ষে একটি আনুষ্ঠানিক বিজয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই বিজয়ঘোষণামূলক ঐতিহাসিক ভাষণে, আবু উবাইদা অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন পাঁচটি শক্তির প্রতি-ইরান, হিজবুল্লাহ, হুথি, ইরাকের মুজাহিদদের এবং জর্ডানের ফিলিস্তিনি জনগণকে। এই কৃতজ্ঞতায় ছিল না কোনো আরব রাষ্ট্র, ছিল না পারমাণবিক শক্তিধর পাকিস্তান, ছিল না সুলতানের দেশ তুর্কি, ছিল না তালিবান, কিংবা কোনো সুন্নিপন্থী জিহাদী গ্রুপ গুলো। তিনি সম্মান অর্পণ করেন ত্যাগ ও নেতৃত্বের প্রতীক-ইসমাইল হানিয়া, ইয়াহিয়া সিনওয়ার এবং হাসান নাসরুল্লাহকে। আজকে সেই প্রেরণাদায়ক বিজয়-ভাষণকে অবলম্বন করে, এই মহান প্রতিরোধের স্তম্ভদের নিয়ে কলম ধরতে চলেছি।

হিজবুল্লাহ, হুথি ও ইরাকি সম্মুখভাগ-এক প্রান্তিক যুদ্ধের অন্তঃস্রোত মাত্র কয়েকটি দিবসের ব্যবধানে লেবাননের শামরিক ইসলামপন্থী সংগঠন হিজবুল্লাহ, গাজাভিত্তিক প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস-এর পক্ষ অবলম্বন করে সীমান্তের প্রান্তরেখায় ইসরায়েলের বিরুদ্ধে একটি সীমিত কিন্তু সুপরিকল্পিত ছায়াযুদ্ধ শুরু করে। যদিও রাজনৈতিক কূটচাল ও কৌশলগত ভারসাম্যের বিচারে তারা সরাসরি যুদ্ধে সম্পৃক্ত হতে অনাগ্রহী ছিল, তথাপি বাস্তবতা ও প্রেক্ষিত তাদের ঠেলে দেয় পূর্ণমাত্রিক সংঘাতে।

এই দ্বন্দ্বে হিজবুল্লাহ তাদের আধ্যাত্মিক ও কার্যকর নেতৃত্বের প্রতীক, মহাসচিব হাসান নাসরুল্লাহ-কে হারায়। এছাড়া শহীদ হন ১৩ জন প্রধান সামরিক স্থপতি।

১৫ জানুয়ারি ২০২৫-ইতিহাসের পাতায় খোদাই হওয়া এক গৌরবময় দিন। এই দিনেই দ্বিতীয় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়, যেটি হামাসের পক্ষে একটি আনুষ্ঠানিক বিজয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই বিজয়ঘোষণামূলক ঐতিহাসিক ভাষণে, আবু উবাইদা অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন পাঁচটি শক্তির প্রতি-ইরান, হিজবুল্লাহ, হুথি, ইরাকের মুজাহিদদের এবং জর্ডানের ফিলিস্তিনি জনগণকে। এই কৃতজ্ঞতায় ছিল না কোনো আরব রাষ্ট্র, ছিল না পারমাণবিক শক্তিধর পাকিস্তান, ছিল না সুলতানের দেশ তুর্কি, ছিল না তালিবান, কিংবা কোনো

১৫ জানুয়ারি ২০২৫-ইতিহাসের পাতায় খোদাই হওয়া এক গৌরবময় দিন। এই দিনেই দ্বিতীয় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়, যেটি হামাসের পক্ষে একটি আনুষ্ঠানিক বিজয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই বিজয়ঘোষণামূলক ঐতিহাসিক ভাষণে, আবু উবাইদা অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন পাঁচটি শক্তির প্রতি-ইরান, হিজবুল্লাহ, হুথি, ইরাকের মুজাহিদদের এবং জর্ডানের ফিলিস্তিনি জনগণকে। এই কৃতজ্ঞতায় ছিল না কোনো আরব রাষ্ট্র, ছিল না পারমাণবিক শক্তিধর পাকিস্তান, ছিল না সুলতানের দেশ তুর্কি, ছিল না তালিবান, কিংবা কোনো সুন্নিপন্থী জিহাদী গ্রুপ গুলো। তিনি সম্মান অর্পণ করেন ত্যাগ ও নেতৃত্বের প্রতীক-ইসমাইল হানিয়া, ইয়াহিয়া সিনওয়ার এবং হাসান নাসরুল্লাহকে। আজকে সেই প্রেরণাদায়ক বিজয়-ভাষণকে অবলম্বন করে, এই মহান প্রতিরোধের স্তম্ভদের নিয়ে কলম ধরতে চলেছি।

হিজবুল্লাহ, হুথি ও ইরাকি সম্মুখভাগ-এক প্রান্তিক যুদ্ধের অন্তঃস্রোত

মাত্র কয়েকটি দিবসের ব্যবধানে লেবাননের শামরিক ইসলামপন্থী সংগঠন হিজবুল্লাহ, গাজাভিত্তিক প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস-এর পক্ষ অবলম্বন করে সীমান্তের প্রান্তরেখায় ইসরায়েলের বিরুদ্ধে একটি সীমিত কিন্তু সুপরিকল্পিত ছায়াযুদ্ধ শুরু করে। যদিও রাজনৈতিক কূটচাল ও কৌশলগত ভারসাম্যের বিচারে তারা সরাসরি যুদ্ধে সম্পৃক্ত হতে অনাগ্রহী ছিল, তথাপি বাস্তবতা ও প্রেক্ষিত তাদের ঠেলে দেয় পূর্ণমাত্রিক সংঘাতে।

এই দ্বন্দ্বে হিজবুল্লাহ তাদের আধ্যাত্মিক ও কার্যকর নেতৃত্বের প্রতীক, মহাসচিব হাসান নাসরুল্লাহ-কে হারায়। এছাড়া শহীদ হন ১৩ জন প্রধান সামরিক স্থপতি, যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যঃ

ডেপুটি নেতা হাশেম সাফিয়েদ্দিন, সেনাপ্রধান ফুয়াদ শুকর, রাদওয়ান ফোর্স কমান্ডার ইব্রাহিম আকিল, দক্ষিণ ফ্রন্টের তত্ত্বাবধায়ক আলি কারাকি এই যুদ্ধ হিজবুল্লাহর প্রায় ৪ হাজার প্রশিক্ষিত ফিদায়িন-এর রক্তে রঞ্জিত হয়। অন্যদিকে, ইয়েমেনের প্রান্তিক মরুভূমি থেকে উঠে আসা হুথি বিদ্রোহীরা ভৌগোলিক দূরত্ব সত্ত্বেও, সমুদ্রপথে ইসরায়েলের বাণিজ্যিক প্রবাহে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে প্রতিরোধের একটি নৌ-অধিকরণ কৌশল গড়ে তোলে। হামাসের প্রতি আনুগত্য জানাতে তারা নিজস্ব অস্ত্রভাণ্ডার

নিঃশেষ করে দেয়, এবং তাদের শত শত যোদ্ধা আকাশ থেকে নিক্ষিপ্ত বারুদের নিচে আত্মোৎসর্গ করে।

ইরাকি শিয়া মিলিশিয়া ফ্রন্টসমূহ, ইরানের কূটনৈতিক ছত্রছায়ায়, হিজবুল্লাহর ছায়াকৌশল অনুসরণ করে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দিকচক্রবাল ঘেরাও কৌশল প্রয়োগ করে। এদের কিছু ক্ষেপণাস্ত্র তেলআবিবের আকাশে গর্জে উঠে। যদিও সামরিক শক্তির বিচারে এই ত্রিমুখী প্রতিরোধশক্তির সম্মিলিত সামর্থ্য ইসরায়েলের সামরিক পরাক্রমের এক দশমাংশও নয়, তথাপি এদের অবস্থান ছিল চূড়ান্তভাবে প্রতীকী ও মনস্তাত্ত্বিক কৌশলে প্রভাবশালী।

বিপরীতে, আরব জোটের তথাকথিত শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহ, বিশেষত মিশর ও সৌদি আরব, নীরব কূটনীতির পর্দার আড়ালে ইসরায়েলের প্রতি অঘোষিত সহমর্মিতা ও প্ররোচনার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তারা ইরানি প্রভাববলয় ও তার প্রক্সি বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করার লীলানীতিতে অংশ নেয়, যার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়-মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতি এখন আর ধর্মীয় অনুভূতির নয়, বরং নিখাদ স্বার্থের অঙ্ক।

ইরানঃ একমাত্র রাষ্ট্র যে সরাসরি ফিলিস্তিনের প্রতিরোধের পক্ষে অস্ত্রহাতে দাঁড়ায়-আর তার মূল্য দেয় রক্ত দিয়ে, রাষ্ট্রপ্রধান দিয়ে।

১৯ মে ২০২৪। কলেজ শেষ, বাসে বসে মোবাইল খুলতেই বিশ্ব রাজনীতির মানচিত্র কেঁপে ওঠে ইরানের রাষ্ট্রপতি সাইয়েদ ইব্রাহিম রাইসি এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আব্দোল্লাহিয়ান এক নির্মম হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় শহীদ হন।

জানার অপেক্ষা থাকে না-এই "দুর্ঘটনা" নিছক প্রাকৃতিক নয়, বরং বহুজাতিক গুপ্ত কূটনীতির রক্তাক্ত ছোবল।

ইরান, কেবল বিবৃতি দিয়ে নয়, অস্ত্র, অর্থ ও আদর্শিক শক্তি দিয়ে-তার সমগ্র প্রতিরোধ অক্ষ (resistance axis)-কে উন্মুক্ত করে দেয়।

গাযার আকাশে যখন আগুন, তেহরান তখন নিঃশব্দ নয়-প্রক্সিদের মাধ্যমে নয়, এবার নিজেই ময়দানে নেমে পড়ে।

১ এপ্রিল ২০২৪-দামেস্কে ইরানের কনস্যুলেটে ইসরায়েলি হানায় শহীদ হন কুদস ফোর্সের অভিজাত কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ রেজা জাহেদি।

এই হামলার জবাব দিতে ইরান আর নীতিকথার আশ্রয় নেয় না-ইতিহাসে লিখে যায় এক নতুন অধ্যায়:

অপারেশন ট্রু প্রমিস ১৪ এপ্রিল ২০২৪

ইরান প্রথমবারের মতো তার নিজ ভূখণ্ড থেকে সরাসরি ইসরায়েলের দিকে বিপুল ব্যালিস্টিক শক্তির অনলবর্ষণ করে।

ছোঁড়া হয় -

- ✓ ১৭০+ সশস্ত্র ড্রোন
- ✓ ১২০ ব্যালিস্টিক মিসাইল
- ✓ ৩০ ক্রুজ মিসাইল

যুদ্ধবিধ্বস্ত আকাশে এই ঘূর্ণাবর্ত কেবল শত্রুকে নয়, গোটা আরব বিশ্বকে বার্তা দেয় -"আমরা প্রমাণ দিয়ে বলি, প্রলাপ দিয়ে নয়।"

ইসরায়েল যদিও সামরিক প্রযুক্তির জোরে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি থেকে বেঁচে যায়, তবু এক অস্বস্তিকর বাস্তব স্পষ্ট হয়:

আরব রাষ্ট্রগুলো যখন তেল আর অস্ত্র চুক্তির মোহে নিজেকে বিকোয়, ইরান তখন অগ্নিমন্ত্র পড়ে মাঠে নামে।

তেহরানের অগ্নিমণ্ডিত আকাশে একদিকে নতুন যুগের শপথ, আর অন্যদিকে প্রতিরোধের শেষ মহানায়ক পতনের শোকগাথা পেজেশকিয়ানের অভিষেক আর ইসমাইল হানিয়ার শাহাদাত একসাথে ইতিহাসকে রক্তাক্ত করে তোলে।

মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই ইরানের নবনির্বাচিত সংস্কারপন্থী প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ান শপথগ্রহণ করেন। সেই সময়ে এক রাষ্ট্রীয় আলোচনায় উনি বলেছিলেন-"নেতা আসে, নেতা যায় ইতিহাস থেমে থাকে না।"

কিন্তু কে জানতো, এই বাক্যই রাতের নিস্তব্ধতা ছিঁড়ে তাঁরই মাটিতে ঘটবে এক মহাকাব্যিক বিস্ফোরণ?

৩১ জুলাই ২০২৪, তেহরান।

ইরানের রাজধানীর কূটনৈতিক অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে ইসমাইল হানিয়া, প্রতিরোধের শিরোমণি, ফিলিস্তিনের আত্মার কণ্ঠস্বর, ইসরায়েলি গোয়েন্দা বাহিনীর এক নির্মম, পূর্বপরিকল্পিত ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় শাহাদাতবরণ করেন।

একটি কক্ষে স্থাপনকৃত স্মার্ট টার্গেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে চালানো হয় সেই আঘাত রাষ্ট্রীয় আতিথেয়তা রূপ নেয় এক রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অন্তর্ঘাতে।

তিনি, যিনি আগেই তাঁর তিন পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতিদের শহীদ হিসেবে কবর দিয়েছিলেন, বলতেন-"আমার পরিবারের রক্ত প্রতিরোধের খোরাক পবিত্র মৃত্যু আর কী হতে পারে?" এর চেয়ে এইবার সেই পবিত্র মৃত্যুর মর্যাদা নিজে লাভ করলেন শহীদের মর্যাদায়, অগ্নিগর্ভ রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে। আরব দুনিয়ার উদাসীন, ক্ষমতালিপ্স স্বৈরশাসকগণ, যারা বলত-

"হানিয়া যুদ্ধ লাগিয়ে কাতারে বিলাসে দিন কাটায়,"

তাদেরকে ইতিহাস এক নিশব্দ অথচ জ্বলন্ত উত্তর দিল

"নেতা তো শুধু যুদ্ধ শুরু করে না, শহীদের গর্বে বিদায়ও নিতে জানে।"

এই মৃত্যু ছিল না কেবল একটি প্রাণহানি গুলি করে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়ার ব্যর্থ প্রয়াস। এটি ছিল প্রতিরোধের আত্মাকে হানিয়ার রক্ত এখন তেহরানের রাজপথ থেকে গাজার অলিগলি পর্যন্ত নতুন প্রজন্মের শিরায় প্রবাহিত হবে।

ইয়াহিয়া সিনওয়ার-উম্মাহর অগ্নিসন্তান, যাঁর শাহাদাত আমাদের লজ্জা, শিক্ষা এবং চিরঋণ

ওই যে, যাকে আমি শুরুতেই বলেছিলাম-

"একবিংশ শতাব্দীর সালাহউদ্দিন", আজ ইতিহাস তাঁর নাম লিখলো শহীদের রক্তিম অক্ষরে। তিনি আর কেউ নন-ইয়াহিয়া সিনওয়ার।

নেতৃত্বের আরশে বসেও ময়দান ছাড়েননি। সঙ্গী ছিলেন হাতে গোনা ক'জন, কিন্তু হৃদয়ে ছিল একটি জাতির দীপ্ত প্রতিজ্ঞা। শত্রুর ঘাড়ের কাছে থেকেও পিছু হটেননি। ড্রোনচিত্রে ধরা পড়েছে-

জীবনের অন্তিম মুহূর্তে তিনি একটি লাঠি তুলে ছুঁড়ে মারছেন শত্রু ড্রোনের দিকে। কোন পাষাণের হৃদয়েও কাঁপন ধরিয়ে দেয় এমন দৃশ্য। কি দুর্দমনীয় সাহস! কি অমোঘ আস্থার প্রদীপ। তিনি বুঝিয়ে দিলেন-নেতৃত্ব মানে কেবল হুকুম দেওয়া নয়, বরং প্রথম শহীদ হওয়ার প্রস্তুতি।

তাঁর মৃত্যু-পূর্ব বিবরণে জানা যায়-টানা আঠারো দিন উপবাসে ছিলেন তিনি, যেন রক্তে-রক্তে খোদার সাথে নীরব চুক্তি সেরে নিচ্ছিলেন।

ইসরায়েল নিজেই তাদের তদন্তে স্বীকার করেছে-"সিনওয়ারের দেহে অ্যালকোহলের লেশমাত্র ছিল না। "এ এক নৈতিক পরিশুদ্ধতার শিরোনাম, যা তথাকথিত মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের মুখোশ ছিঁড়ে দেয়।

হে উম্মাহ, এই শহীদ তোমাদের জিহাদের শিক্ষা, চরিত্রের আলোকদীপ, আত্মত্যাগের ভাষা শিখিয়ে চলে গেলেন।

আর আমরা? আমরা ছিলাম নিশ্চুপ, নির্বাক, নিষ্ক্রিয়-আমরা ছিলাম ঘরের ভিতর আলো জ্বালিয়ে গাজার আগুন দেখে চা খাওয়া নব্য প্রজন্ম।

ক্ষমা করে দিও হে সিনওয়ার, তুমি যখন শহীদদের কাতারে দাঁড়িয়ে উম্মাহর দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেবে-"তোমরা কী করেছিলে? "তখন আমরা সবাই,

নিজ নিজ লজ্জায়, অপারগতায়, ব্যর্থতায় মাথা নিচু করে ফেলবো।

আর আমি? আমি-ই বা কী জবাব দেবো তোমার সেই দীপ্ত দৃষ্টির সামনে?

তুমি যে আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে গর্বিত প্রশ্নচিহ্ন।

হাসান নাসরাল্লাহর শাহাদাত এবং তার জানাজা ছিল ইতিহাসের এক বিস্ময়কর ও বিপ্লবাত্মক অধ্যায়।

২০২৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর, বিশ্ববিবেক স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল-বৈরুতে নিজের আবাসস্থলে ইসরায়েলি রকেট হামলায় শহীদ হন হিজবুল্লাহর অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেক্রেটারি জেনারেল, হাসান নাসরাল্লাহ। এটি ছিল হিজবুল্লাহর ইতিহাসে সবচেয়ে মর্মান্তিক ও কৌশলগত ক্ষয়ক্ষতির একটি। এর কিছুদিন আগেই ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেইনি ব্যক্তিগতভাবে তাকে আহ্বান জানিয়েছিলেন-ইরানে ফিরে আসার জন্য। কারণ শত্রুর ছায়া ঘনিয়ে আসছিল। কিন্তু নাসরাল্লাহ, যার রক্তে ছিল কারবালার আত্মত্যাগের চেতনা, তিনি প্রাসাদগাত্র নিরাপত্তার বদলে বেছে নিয়েছিলেন শহীদ হওয়ার গৌরবময় পথ। তিনি পিছু হটেননি। তিনি ময়দান ছাড়েননি। তিনি দেখিয়েছেন, একজন নেতা কেবল ভাষণে নয়-মৃত্যুর মুহূর্তেও জাতিকে জাগিয়ে রাখতে পারেন।

তবে ইতিহাসের গৌরবময়তম অধ্যায়টি রচিত হয় তার জানাজায়-২০২৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি। বৈরুতের ক্যামিল শামুন স্টেডিয়াম, জনসমুদ্রে রূপ নিয়েছিল। সেই সময়ও আকাশে ঘোরাফেরা করছিল ইসরায়েলের এফ-১৬ যুদ্ধবিমান। গোপন সূত্রে জানা যায়, পরিকল্পনা ছিল-জানাজায় উপস্থিত লাখো জনতার ওপর বিমান হামলা চালানোর। এটি ছিল এক মনস্তাত্বিক যুদ্ধের চূড়ান্ত পদক্ষেপ। কিন্তু যা ঘটেছিল, তা ছিল শত্রুর কল্পনাকেও ছাড়িয়ে। সেদিন একটি মানুষও পিছু হটেনি। কেউ মাথা নত করেনি। বরং জনতা, চোখে অগ্নিশিখা নিয়ে, আকাশের দিকে তাকিয়ে সম্মিলিত কণ্ঠে চিৎকার করছিল-"আল-মাওত লি ইসরাইল।" (ইসরায়েলের মৃত্যু হোক।)।

সেদিন শুধু একজন শহীদের জানাজা হয়নি, সেদিন মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক মানচিত্রে এক নতুন চেতনার পুনর্জন্ম ঘটেছিল-যা জানিয়ে দেয়, বোমা দিয়ে বিশ্বাস মুছে ফেলা যায় না।

স্লোগান মুখর জুলাই

- আ.হ.ম. ইয়াছিন, গ্রন্থাগারিক, সিআইএমসি

কোটাব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে গত বছরের ১ জুলাই আন্দোলনে নামে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। অভূতপূর্ব এই গণ-আন্দোলনেকে চাঙা রেখেছিল বিভিন্ন স্লোগান, যা উড়াল সময়ে রাজপথে মানুষকে সাহস ও প্রেরণা দিয়েছিল। আন্দোলনকারীদের মধ্যে এসব স্লোগান বারুদের মতো কাজ করে, জোগায় ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের প্রেরণা।

'তুমি কে আমি কে, রাজাকার রাজাকার, কে বলেছে কে বলেছে, স্বৈরাচার স্বৈরাচার।

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-পুতিরা চাকরি পাবে না, 'তাহলে কি রাজাকারের নাতি-পুতিরা পাবে? সেই রাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা উত্তাল হয় এক স্লোগানে 'তুমি কে আমি কে? রাজাকার, রাজাকার। কে বলেছে কে বলেছে? স্বৈরাচার, স্বৈরাচার।

রংপুরের আবু সাঈদ সহ শহীদ হন অন্তত ছয়জন। আবু সাঈদের মৃত্যু নাড়িয়ে দেয় গোটা দেশের মানুষকে। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের মিছিলের অন্যতম। প্রধান স্লোগান ছিল: ‘বুকের ভেতর অনেক ঝড়, বুক পেতেছি আওয়ামী লীগ সংবাদের ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক দাবি করেন, সরকার ইন্টারনেট বন্ধ করেনি। আন্দোলনকারীরা ডেটা সেন্টার পুড়িয়ে দেওয়ায় আপনাআপনি বন্ধ হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, আমরা ইন্টারনেট বন্ধ করি নাই, একা একা বন্ধ হয়ে গেছে।

‘জন্মভূমি অথবা মৃত্যু’ বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবেও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে স্লোগানটি। বিপ্লবের মহাপুরুষ ভয়েভেরার স্লোগানটি ছড়িয়ে যায় ছাত্র-জনতার মুখে মুখে সামজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে শুরু করে রাজপথ সবখানে উচ্চারিত হয়, জন্মভূমি অথবা মৃত্যু।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা পর্যন্ত নেমে আসে রাজপথে আন্দোলনে ক্লান্ত শিক্ষার্থীদের পানি বিতরণ করছিলেন মীর মুগ্ধ রাজধানীর উত্তরার রাস্তায় পানি হাতে তার চেঁচিয়ে বলা- পানি লাগবে পানি? কথাটি শক্তি জোগায় আন্দোলনে। ১৮ জুলাইয়ের দিনটিতে পানি বিতরণের মাকেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন শহীদ মুগ্ধ।

আওয়াজ উডা, কথা ক

শোনো মহাজন, আমরা অনেকজন

শূন্য ব্যান্ডের শোনো মহাজন' গানটি মুক্তি পায় ২০১৪ সালে। গানের কথাগুলোতে মিশে ছিল বিপ্লবের তেজ। গানটির দুটি লাইন- শোনো মহাজন, আমি নয় তো এক জন শোনো মহাজন, আমরা অনেক জন জুলাইয়ে এটি নতুন করে আলোচনায় আসে। সবার কণ্ঠে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ও রাজপথে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অন্যতম অস্ত্র হয়ে ওঠে গানের লাইনগুলো।

আমার ভাইয়ের রক্ত বৃথা যেতে দেব না

আন্দোলন-সংগ্রামের সময়টাতে ছাত্রলীগ ও পুলিশের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছে অসংখ্য মানুষ। যার কারণে, এটি হয়ে ওঠে গণমুক্তির লড়াই। গোটা দেশের রাজপথ প্রতিনিয়ত মুখর হয়েছিল, 'আমার ভাইয়ের রক্ত বৃথা যেতে দেব না' স্লোগানে।

শেখ হাসিনা পালায় না

১৬ থেকে ১৮ জুলাই বেগবান হতে থাকা আন্দোলনের সময় চাউর হয়, দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন শেখ হাসিনা। অবস্থান নিয়েছেন ভারতে। পরদিনই অবশ্য সংবাদ সম্মেলনে দম্ভের সঙ্গে হাসিনা বলেন, 'শেখ হাসিনা পালায় না।

শি হ্যাজ মেইড আস

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের জাতীয় নির্বাচনের আগে এক জনসভায় শেখ হাসিনার প্রশংসায় বলেছিলেন, শি হ্যাজ মেড আস স্ট্যান্ড টলার। সেই বক্তব্যে ভুল ইংরেজিতে আরও কিছু কথা বলেন কাদের। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পর সেই বক্তব্যের স্যাটায়ার করে ছাত্র-জনতা তৈরি করে নতুন স্লোগান 'শি হ্যাজ মেইড আস ফ্লাই ফাস্টার।

পালাব না, প্রয়োজনে ফখরুল সাহেবের বাড়িতে যাব।

ওবায়দুল কাদেরের আরেকটি বক্তব্যের অংশ ভাইরাল হয়। আওয়ামী লীগ বেশিদিন টিকবে না, এমন কথার পরিপ্রেক্ষিতে কাদের মজা করে বলেছিলেন, পালাব না প্রয়োজনে ফখরুল সাহেবের বাড়িতে যাব, আওয়ামী লীগের পতনের পর সেটি রীতিমতো ভাইরাল হয়ে যায়।

বিকল্প কে? আমি, তুমি, আমরা আমরা

শেখ হাসিনার বিকল্প বাংলাদেশে নেই, গত ১৬ বছরে অসংখ্যবার এই কথা বলেছেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতন হলে সত্যিকার অর্থে বিকল্প নিয়ে ভাবনা তৈরি হয় কে ধরবেন দেশের হাল, এমন প্রশ্নে তখন ছাত্র জনতার স্লোগান ছিল বিকল্প কে? আমি, তুমি,

আমরা

রক্ত মাড়িয়ে সংলাপ না।

আবু সাঈদের মৃত্যুর মাত্র দুদিন পর মুগ্ধর নির্মম পরিণতি মেনে নেয়নি ছাত্র জনতা। পরিস্থিতি আরও অবনতির দিকে গেলে সরকার সংলাপে বসতে চেয়েছিল তবে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ১৮ জুলাই রাতে লেখেন, রক্ত মাড়িয়ে সংলাপ নয়

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে এমন অসংখ্য জোগান ও ডায়লগ ভাইরাল হয়। যার কোনোটি ছিল আগুনে ঘি, কোনোটি আবার সংগ্রামের মাঝে একটি বিনোদন।

আরও যেসব স্লোগান ঘাত্র-জনতার মুখে মুখে ছিল তার মধ্যে আছে আমার সোনার বাংলায় বৈষম্যের ঠাঁই নাই, 'একাত্তরের হাতিয়ার গর্জে ওঠো আরেকবার, 'যে হাত গুলি করে, যে হাত ভেঙে দাও', 'অ্যাকশন অ্যাকশন ডাইরেক্ট অ্যাকশন', 'আমার ভাই কবরে, খুনিরা কেন বাইরে', 'আমার ভাই জেলে কেন, গুলি করে আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না, জাস্টিস জাস্টিস, উই ওয়ান্ট জাস্টিস, জ্বালো রে জ্বালো, আগুন জ্বালো, দিয়েছি তো রক্ত, আরও দেব রক্ত, অনাস্থা অনাস্থা, স্বৈরতন্ত্রে অনাস্থা, চেয়ে দেখ এই চোখের আগুন, এই ফাগুনেই হবে দ্বিগুণ', 'তবে তাই হোক বেশ, জনগণই দেখে নিক এর শেষ, আমরা আম-জনতা, কম বুঝি ক্ষমতা, তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে' 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস', 'হাল ছেড়ো না বন্ধু বরং কণ্ঠ ছাড় জোরে, 'ফাইট ফর ইওর রাইটস, নিউটন বোমা বোঝো মানুষ বোঝো না'। আরও ছিল আঞ্চলিক স্লোগান, 'আর ন হাঁইয়্যো, বৌতদিন হাঁইয়্যো (আর যেয়ো না, অনেক দিন খেয়েছ।

রক্তে অর্জিত ৩৬ জুলাই

- মোঃ নোমানুল আহসান
(প্রশাসনিক কর্মকর্তা) একার্ড (ক্লিনিক্যাল)

৩৬ জুলাই নতুন বাংলার এক মহাবিপ্লবের নাম। যে মহাবিপ্লবে দেশের প্রতি ভালোবাসা, মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধার প্রমাণ হয় রক্তের ত্যাগে। এই মহাবিপ্লবের মাধ্যমেই ফ্যাসিবাদ স্বৈরাচারের ১৭ বছরের বৈষম্য, গুম, খুন, জুডিসিয়াল কিলিং, ধর্ষন, অর্থ পাচার সহ সকল জুলুম নির্যাতনের অবসানের স্বপ্ন বুনেছে মাতৃভূমির তরুণ, বৃদ্ধ-বনিতা, সকল শ্রেণী, পেশা, ধর্ম, বর্ণের নির্যাতিত কুড়ি কোটি জনতা।

৩৬ জুলাই আইকনিক বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন হলেও এটি ছিল জুলুমবাজের ১৭ বছরের জুলুম থেকে মুক্তির আন্দোলন। যুগ যুগ ধরে ইতিহাস স্বাক্ষী ফ্যাসিবাদরাই ফ্যাসিবাদের কবর রচনা করেছে। তেমনি একটি মজার হিসেব কষলে ২৪এর গণঅভ্যুত্থানের হিসেব পাওয়া যায়। এই আন্দোলনে আইকনিকরা সবাই ২৫-২৬ বছরের শিক্ষার্থী। ২০০৯ইং সালে বাংলাদেশে যখন ফ্যাসিবাদের সূচনা হয়, তখন এই আইকনিকদের বয়স ছিল ৯-১০ বছর, অর্থাৎ ৩য়-৪র্থ ক্লাসের শিক্ষার্থী। ফ্যাসিবাদের সূচনালগ্ন থেকে তারা বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করে তাদের পৈত্রিক সম্পদে রূপান্তর করে। তারই ধারাবাহিকতায় তারা পাঠ্যপুস্তক থেকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা তুলে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস শিক্ষা দেয়ার ব্যার্থ চেষ্টা চালিয়েছে। বাংলার যেই জেন-জি আইকনিকদেরকে ৪র্থ-৫ম শ্রেণী থেকে অনার্স-মাষ্টার্স পর্যন্ত বিকৃত ইতিহাস শিখিয়েছে যেই স্বৈরাচার, সে বিকৃত ইতিহাসের প্রতিফলনের স্বরুপ আইকনিকরা স্লোগান ধরেছে-

তুমি কে? আমি কে?
রাজাকার, রাজাকার।
কে বলেছে? কে বলেছে?
স্বৈরাচার, স্বৈরাচার।

আর এই স্লোগানের দম্ভে স্বৈরাচার সিঁধ চোরেরমত হিন্দুস্তানে গিয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে।

২০০৯ সালে ২৯ ডিসেম্বর যখন ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটে তখন আমি অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তি হই। দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করে তোলার পরিকল্পনা নেয় ছাত্রলীগ। তারই ধারাবাহিকতায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র শরীফুজ্জমান নোমানী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র মহিউদ্দিন মাসুমকে নৃশংসভাবে পৈচাশিক কায়দায় হত্যা করার মাধ্যমে শুরু করে। ২০১০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম মহানগরীতে মহিউদ্দিন মাসুমকে হত্যার প্রতিবাদ মিছিলে পুলিশ ও ছাত্রলীগের অতর্কিত হামলায় আমিসহ অসংখ্য ছাত্র আহত ও গ্রেফতার হয়। ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারী পিলখানায় হাসিনার নির্দেশে ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাসহ মোট ৭৪ জনকে হর্ত্যা করে।

২৯জুন মিথ্যা অভিযোগে স্বৈরাচার হাসিনা সাবেক শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমার নিজামী, আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীসহ জাতীর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের গ্রেফতার করে এবং যুদ্ধাপরাধের ক্যাংগারু ট্রাইব্যুনাল গঠন করে সাজানো বিচার শুরু করেন। তারই প্রতিবাদে বাংলার ইসলাম প্রিয় তৌহিদি জনতা আন্দেলন করলে নির্বিচারে গ্রেফতার হতে থাকে। বাসা-বাড়ীতে কিংবা ম্যাসে থাকতে পারতো না মুসলমান ও নামাজী ছাত্র/চাকুরীজীবীরা।

২০১৩ সালে ৫ ফেব্রুয়রী অবৈধ ট্রাইব্যুনালের প্রথম রায়ের প্রতিবাদে সারা দেশে সর্বস্তরের জনতা প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসলে ফ্যাসিস্ট হাসিনার নির্দেশে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে পুলিশ হত্যা করে ইমরান ও আবিদ, গুলিবিদ্ধ ও গ্রেফতার হই আমিসহ অসংখ্য সাধারণ জনতা। অপরদিকে স্বৈরাচার হাসিনার পালিত নাস্তিকরা রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে ও নিরাপত্তায় গঠন করে গণজাগরন মঞ্চ। ৫ মে ঢাকার শাপলা চত্ত্বরে হেফাজত ইসলামের সমাবেশে ক্রেক ডাউন চালিয়ে হাসিনার নির্দেশে রাষ্ট্রীয় বাহিনী দ্বারা অসংখ্য আলেম ওলামাকে হত্যা করা হয় এবং হতাহত হয় অসংখ্য। ২৫মে কিং অব চিটাগং কমিউনিটি সেন্টারে প্রবাহ কোচিং সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এসএসসি তে A+ প্রাপ্তদের সংবর্ধ্বনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল দল ও মতের শিক্ষার্থী ও অভিভাবক, কিন্তু খুনি হাসিনার পালিত বাহিনী ওসি প্রদিপের নেতৃত্বে সেখানে হানা দিয়ে আমিসহ শতাধিক সাধারণ জনতাকে গ্রেফতার করে।

২০১৪সালে ৫ই জানুয়ারী হাসিনার গৃহপালিত একমাত্র বিরোধীদল জাতীয়পার্টিকে নিয়ে এককভাবে নির্বাচন করে, আবারও অবৈধভাবে ক্ষমতার মসনদ দখল করে। সাজানো অবৈধ ট্রাইব্যুনালের ফরমায়েশি রায়ের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের অনেক বীর সন্তানদের জুডিশিয়াল কিলিং করা হয়।

২০১৮ সালে আবারও পাতানো নির্বাচনের মাধ্যমে অবৈধভাব ক্ষমতা দখল করে। সর্বশেষ ২০২৪ সালের ৭ নভেম্বরের ডামি নির্বাচনের নির্বাচন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার হতে বাধ্য করে জীবন্ত স্বাক্ষী হয়ে ছিলাম।

এই ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচারের শাসনামলে আমি কয়েকটি সরকারী চাকুরীতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও বৈষম্যের স্বীকার হয়েছি। অসংখ্য মেধাবী এ বৈষম্যের স্বীকার হয়ে ক্যারিয়ার হারিয়েছে। তাইতো গত ১৭ বছরের গুম, খুন ও বৈষম্যের স্বীকার হতে হতে যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে তখন তারা স্লোগান ধরেছে-

বুকের ভিতর অনেক ঝড়,
বুক পেতেছি গুলি কর।

২০২৪ এর জুলাই ক্যালেন্ডারের কোন পৃষ্ঠা হিসেবে নয় বরং পৃথিবীর দুষ্প্রাপ্য এক ঐতিহাসিক মহাবিপ্লবের নাম। যার পরতে পরতে আছে জ্বালিম ফ্যাসিস্টের নির্যাতন ও তা প্রতিরোধের বিভীষিকাময় গল্প।

জুলাই মহাবিপ্লবের শুরু হয় মূলত সরকারি চাকুরিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা ইস্যু নিয়ে। দেশজুড়ে শিক্ষার্থীদের তুমুল আন্দোলনের মুখে ২০১৮ সালের ৪ অক্টোবর সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা ৩০ শতাংশ বাতিল করে পরিপত্র জারি করে সরকার। এক রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে ২০২৪ সালের ৬জুন হাইকোর্টের সরকারি চাকুরিতে ৩০% মুক্তিযোদ্ধা কোটা পূনর্বহালের নির্দেশ দেয়। এই বৈষম্য মূলক খবর গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই আন্দোলনের আইকনিকরা একে বৈষম্যমূলক ও অন্যায্য বলে উল্লেখ করে সোচ্চার হতে থাকে।

৯ দফা দাবি নিয়ে "বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন" নামে একটি প্লাটফর্ম গঠণ করে, যা খুবই দ্রুত জাতীয় আন্দোলনে রুপ নেয়। ৪ জুলাই আপিল বিভাগ উক্ত রায় বহাল রাখলে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঘোষনা করে ৫জুলাই থেকে বিক্ষোভ, সড়ক অবরোধ ও অবস্থান কর্মসূচী, এবং ৬জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঘোষনা আসে "বাংলা ব্লকেড" কর্মসূচী যা ৭জুলাই থেকে কার্যকর হয়। ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচার হাসিনা সরকার আন্দোলনের গতি দেখে দিশেহারা হয়ে পড়ে, ফলে তার সরাসরি নির্দেশে রাষ্ট্রীয় আইন শৃংখলা বাহিনী ও ছাত্রলীগ, যুবলীগ, আওয়ামিলীগসহ সোচ্ছার হয়ে আন্দোলন দমানোর জন্য নির্যাতনের স্টিম রোলার চালাতে থাকে। উপায়ান্তর না পেয়ে ১০ জুলাই আপিল বিভাগের রায়ের উপর স্থিতাবস্থা জারি করে। কিন্তু তাতেও ছাত্র জনতার আন্দোলন থামানো যায়নি। জালিমশাহী হাসিনা তখনও এই আন্দোলনের গভীরতা অনুভব করতে পারে নাই, কারণ গত ১৬ বছর সে সকল আন্দোলন এভাবেই দমিয়েছে। ১৪ জুলাই স্বৈারাচার ডাইনি হাসিনা গণভবনে সংবাদ সম্মেলনের ডাক দেয়, সেখানে তার পোষা এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বলে "মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-পুতিরা কোটা পাবে না, তাহলে রাজাকারের নাতি-পুতিরা কোটা পাবে নাকি?"

এই বক্তব্যে সারা দেশের সকল শিক্ষার্থীদের মাঝে আগ্নেগিরির লাভারমত ক্ষোভের সৃষ্টি করে। ঐ রাতেই ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়সহ সারা দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে বাহির হয়-

তুমি কে? আমি কে?
রাজাকার, রাজাকার।
কে বলেছে? কে বলেছে?
স্বৈরাচার, স্বৈরাচার।

সেই মিছিলে হাসিনার সোনার ছেলে নামে খ্যাত ছাত্রলীগের হামলায় আনেক শিক্ষার্থী নিহত ও আহত হয়। ঐ রাতে আহত শিক্ষার্থীরা ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসা নিতে গেলে সেখানে আবার হামলা করে। এভাবে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ নামখ্যাত সন্ত্রাসীরা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর নির্যাতনের স্টিমরোলার চালায়। এতেও দমিয়ে রাখা যায়নি।

১৬ জুলাই দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে সংঘর্ষ। এই দিনটি ছিল আন্দোলনের টার্নিং পয়েন্ট। রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ বুক পেতে দিলে পুলিশ গুলি করে হর্ত্যা করে। এই ঘটনা দেখে সর্বস্তারের জণসাধারণ ক্ষোভে অগ্নিগর্ভা হয়ে ওঠে। সেদিন রাতেই পতিত হাসিনার নির্দেশে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের ঘোষণা আসে। এতেও আন্দোলন থামাতে পারেনি বরং আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ছাত্রলীগ সন্ত্রসীদের হল থেকে তাড়িয়ে ক্যাম্পাসে অবস্থান করে।

১৭ জুলাই ঢাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। চট্টগ্রামে পুলিশ ও অস্ত্রধারী ছাত্রলীগের যৌথ হামলায় প্রাণ হারায় শান্ত ও ওয়াসিম, আহত হয় শতাধিক। এতে যোগ দেয় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

১৮ জুলাই "কমপ্লিট শাটডাউন" কর্মসূচীর ঘোষনা দেয় বৈষম্য বিরোধী ছাত্রআন্দোলন। এই কর্মসূচীতে সারাদেশের সকল শ্রেণী পেশার মানুষ ব্যাপক সাড়া দিয়ে কর্মসূচী পালণ করে। অন্যদিকে সারাদেশে রাষ্ট্রীয় আইন শৃংখলা বাহিনী ও অস্ত্রধারী ছাত্রলীগ সন্ত্রসীদের আক্রমণে প্রাণ হারায় ও আহত হয় অসংখ্য মানুষ। এতো কিছুর পরও শিক্ষার্থীরা হল ও ক্যাম্পাস ছাড়েনি। পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে ফ্যাসিস্ট হাসিনা ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়, ঘোষনা করে কারফিউ, রাস্তায় নামিয়ে দেয় সেনাবাহিনী। এর পরও শিক্ষার্থীদের থামানো যায়নি, বরং দাবানলের ন্যায় জ্বলে উঠে, আন্দোলনকে জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পরের দিন সারাদেশে গায়েবানা জানাজার কর্মসূচী ঘোষনা হয়

১৯ জুলাই আমার চট্টগ্রামের লালদিঘীর মাঠে গায়েবানা জানাজা পূর্ব বক্তব্যে স্বৈরারচার হাসিনা পতনের ডাক দিয়েছি। এর মাঝে একদিকে চলে লাগাতার "কমপ্লিট শাটডাউন" কর্মসূচী অন্যদিকে চলে হাসিনার নির্যাতনের স্টিমরোলার। ঢাকার আকাশ থেকে ও রাজপথে চালানো হয় গুলি। এভাবেই শেষ হয় ৩১জুলাই। প্রাণ হারায় ও পঙ্গুত্ব বরণ করে অসংখ্য সাধারণ মানুষ।

৩৪ জুলাই (৩ আগষ্ট) শহীদ মিনারের সমাবেশ থেকে ১ দফা সরকার পতনের দাবী ঘোষনা করা হয় এবং ৩৭ জুলাই (৬ আগষ্ট) "মার্চ টু ঢাকা" কর্মসূচী ঘোষনা করা হয়।

৩৫জুলাই (৪ আগষ্ট) আমরা চট্টগ্রামসহ সারাদেশে ১দফা সরকার পতনের আন্দোলনে যোগ দিলে "মার্চ টু ঢাকা" কর্মসূচী একদিন এগিয়ে ৩৬ (৫ আগষ্ট) জুলাই ঘোষনা করা হয়। যে যেভাবে পারছে, হেঁটে, গাড়ীতে সাবাই ঢাকা অভিমুখে যাত্র শুরু করে।

৩৬ (৫ আগষ্ট) কোটি জনতা ঢাকায় সমবেত হয়, সকাল থেকেই রাস্তায় নামে প্রাণের ভয় উপেক্ষা করে। বিপদ বুঝতে পেরে ফ্যাসিস্ট হাসিনা দুপুরের আগেই না খেয়ে ভারতে পালল। পালায় তার মন্ত্রীপরিষদসহ সকল সংসদ সদস্য, সকল নেতা কর্মী এবং পালায় জাতীয় মসজিদের ইমাম।

এই বিজয় বাংলার কৃষকের, এই বিজয় বাংলার রিক্সা ড্রাইভারের, এই বিজয় ছাত্র-ছাত্রীদেরসহ সকল শ্রেণী পেশা, দল-মত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল জনতার। সংস্কার হবে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর, বিচার হবে ফ্যাসিবাদ স্বৈরাচারদের।

আশা করি এই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সকল বৈষম্য দূর হবে, দূর হবে রাজনৈতিক হানাহানি, বন্ধ হবে মাতৃভূমীতে পরাশক্তির আগ্রাসণ।

স্মৃতির পাতায় ৩ আগস্ট

- মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
পেশ ইমাম
চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ মসজিদ

দিনটি ছিল ০৩/০৮/২৪ রোজ শনিবার। কোটা সংস্কার আন্দোলনকে ঘিরে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে সারা দেশে পুলিশ, আওমীলীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ ছাত্র-জনতা হত্যার প্রতিবাদ ও ৯ দফার দাবিতে নগরীর নিউ মার্কেট মোড়ে বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিয়েছিল বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

সংগঠনের নির্দেশ ছিলো ব্যাপক জনশক্তি নিয়ে সমাবেশে যোগ দিতে হবে। এই নির্দেশের আনুগত্য করতে গিয়ে শহীদ আব্দুল মালেক ওয়ার্ড থেকে ১৫ জনের একটা টীম নিয়ে দুপুর ২:৪০ মিনিটে সমাবেশের উদ্দেশ্যে রওনা হই। বহদ্দারহাট হতে টমটম নিয়ে সমাবেশ স্থলে পৌঁছার অনেক দূর আগেই অতিরিক্ত জ্যামের কারণে আমরা রাইফেল ক্লাবের সামনে নেমে যাই। গাড়ী থেকে নামার পূর্বেই সবাইকে ওযু করে যার যার মতো করে সমাবেশে যাওয়ার পরামর্শ দিই।

আমি তিন পুলের মসজিদে গিয়ে ওযু করে ২ রাকাত নামাজ আদায় করে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় আমার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় (যুবলীগ) আমাকে বলে "আজকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, আজকে আপনাদেরকে কেউ বাঁধা দিবে না, পুলিশও আক্রমণ করবে না। তবে আজকের মতো শেষ সমাবেশ করে নাও কিন্তু আগামীকাল থেকে মাঠে নামার কোনো সুযোগ দিব না।"

আমি বললাম আপনারা তো কোনদিন আমাদেরকে মাঠে নামার সুযোগ দেন নাই, তাই বলে কি আমরা ঘরের কোনায় হাত গুটিয়ে বসে রয়েছি? কপালে যা আছে, মাঠ ছাড়ব না, এই বলে তার থেকে বিদায় নিয়ে সমাবেশ স্থলে উপস্থিত হই। ইতিপূর্বে সমাবেশ স্থল তথা নিউ মার্কেট চত্তর কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়।

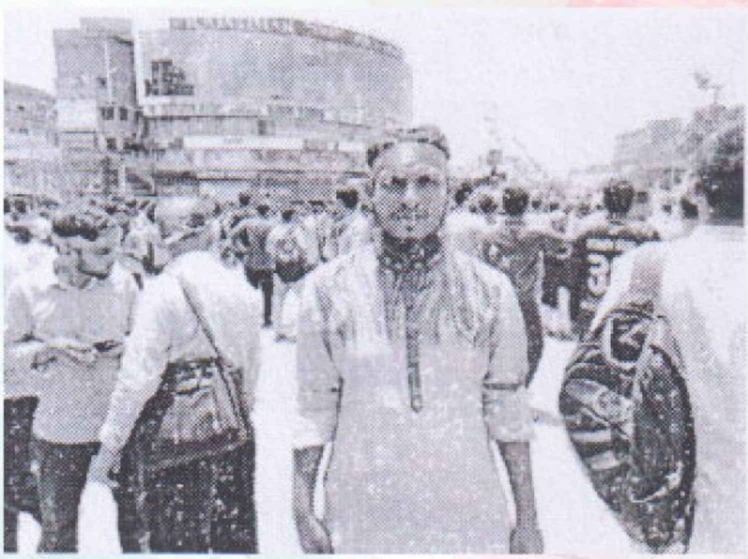

০৩/০৮/২০২৪ নিউ মার্কেট চত্তর

চার দিক দিয়ে ছাত্র জনতার এই বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ স্বৈরাচার বিরোধী নিত্য নতুন স্লোগান, ব্যানার, পেষ্টুন, প্লে-কার্ড ইত্যাদি নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। তাদের সাথে একাত্বতা পোষণ করে ঘুরে ঘুরে প্রায় ২ঘন্টা স্লোগান দিয়েছি। সমাবেশ স্থলে ঘুরতে ঘুরতে এক পর্যায়ে দেখা হয়ে যায় মাহমুদ ভাই, নেজাম ভাই, খলিল ভাই,

আজিজ ভাইয়ের এবং আক্তার কামাল ভাইয়ের সাথে। তারা হাতে লাঠি সোটা নিয়ে বীরের বেশে রেল স্টেশানের একটু আগে টং-এর দোকানে বসে চা খাচ্ছে, তাদের সাথে কুশল বিনিময় করে চা নাস্তা শেষ করে আবার সমাবেশ স্থলে যেতেই সমাবেশের কার্যক্রম আজকের মতো সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। তখন মাগরীবের আজানের বাকী মাত্র ১০ মিনিট। দ্রুত সমাবেশ স্থল ত্যাগ করে তিন পুলের মসজিদে মাগরিবের নামাজ আদায় করে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দেখা হয়ে যায় চট্টগ্রাম মহানগরী উত্তরের শিবিরের সাবেক সভাপতি মরহুম সোহেল রানা ভাইয়ের সাথে।

বহদ্দারহাটে গুলাগুলি:

সোহেল রানা ভাইয়ের বাইকে করে শোলক বহর চলে আসি। সোহেল রানা ভাই ওভার ব্রীজের উপর দিয়ে চাঁন্দগাঁও আবাসিক চলে যায়। আমি বাজার করার উদ্দেশ্যে ওভার ব্রীজের নিচ দিয়ে বহদ্দারহাটে যাওয়ার পথে দেখতে পাই পুলিশ বক্সের আসে পাশে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া এবং প্রচন্ড গুলির শব্দ শুনতে পাই। বিদ্যুৎ না থাকায় ভালভাবে কিছু বুঝা যাচ্ছিলনা। পরে বুঝতে পারলাম নিউ মার্কেট বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে আসা কিছু লোক বহদ্দারহাট এসে মিছিল করায় পুলিশ এবং লীগ মিলে যৌথভাবে গুলি চালায়। গুলির শব্দ শুনে মানুষ দিকবিদিক ছুটছে। আমিও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পেছনের দিকে ফিরে আসতেই একজনের গায়ে ধাক্কা লেগে পড়ে যাই। পড়ার সাথে সাথে একটা গুলি এসে আমার ডান পায়ে আঘাত করলে পা রক্তাক্ত হয়ে যায়।

প্রচন্ড যন্ত্রণার কারণে উঠে দৌড় দিতে পারছিলাম না। মানুষ দৌড়ে পালাতে গিয়ে অনেকজনের পায়ের আঘাতে আমার বাম হাতেও প্রচন্ড আঘাত পাই। বামদিকে ফিরে তাকাতেই দেখি আরো দুইজন ভাই গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে আছে।

ইত্তবসরে দেখলাম একটা খালি রিক্সা আমার দিকে আসতেছে। রিক্সাটা কাছে এসে আমাকে বলে দ্রুত রিক্সায় উঠেন, সাথে সাথে আমি এক পায়ের উপর ভর করে রিক্সায় উঠি। রিক্সা চালকের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম শাহ নেওয়াজ নামের একজন লোক আমার জন্য রিক্সা পাঠিয়েছেন। রিক্সা আমাকে নিয়ে শুলকবহর মাদ্রাসার গেইটে আসলে, শিবিরের সাবেক দায়িত্বশীল শাহ নেওয়াজ ভাইয়ের সাথে দেখা হলো। আমি শাহ নেওয়াজ ভাইকে বললাম, ঐ জায়গায় আরো ২ জন ভাই গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আছেন। তিনি ঐ জায়গায় আরো ২টি রিক্সা পাঠায় এবং আমাকে নিয়ে ষোলক বহর মাদ্রাসার পাশে একটা ফার্মেসীতে নিয়ে যায়। ঐখানে আমার পা থেকে গুলি বের করে প্রাথমিক ব্যান্ডেজ করে দিলে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। এরপর আমি সিএনজি করে আমাদের মেডিকেলে চলে আসি।

এখানে এসে সবাই জিজ্ঞেস করতেছে, কোথায় ব্যথা পেয়েছি। আমি নিরাপত্তা জনিত কারণে কাউকে গুলি খাওয়ার কথা বলিনি শুধু মাত্র ইসমাইল স্যারকে বলেছি। ঐই দিন রাত ১২:৪৫ মিনিটের সময় প্রচন্ড যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আমাদের ইমার্জেন্সীতে চলে আসি। ডা. আবদুল্লাহ আল মামুনের তত্ত্বাবধানে ব্রাদার আলী, ওয়ার্ড বয় আলী এবং রায়হানের সহযোগীতায় লোকাল এনেস্তেশিয়া দিয়ে ক্ষতস্থান ওয়াশ করে পুনরায় ব্যান্ডেজ করে দিলে ব্যাথা কমে যায়।

ইমার্জেন্সী ওটি (সিএমসিএইচ)

আহত হওয়ার কারণে ৪ তারিখের আন্দোলনে মাঠে থাকতে না পারলেও ৫ তারিখ হাসিনা পালানোর পর সব খানে রিক্সা যোগে ঐতিহাসিক আনন্দ মিছিল করে করে গুলি খাওয়ার দুঃখ মোচন করেছি আলহামদুলিল্লাহ। ১৭ জুলাই'২৫ থেকে ৫ আগস্ট'২৫ পর্যন্ত শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে যে আল্লাহ আমাদেরকে মুক্তি দান করেছেন সেই মহান রবের দরবারে আজো কোটি শুকরিয়া আদায় করছি।

রক্তস্নাত সন্ধ্যার পর-একটি না বলা ইতিহাস

- মুহাম্মদ ফায়েদ, প্রাক্তন এডমিন অফিসার (পার্সেজ এন্ড প্রকিউরমেন্ট)

জুলাই'২৪ অনেকের কাছেই এটি দ্বিতীয় স্বাধীনতা, কারও কাছে দীর্ঘদিন গুম থাকা প্রিয়জনকে ফিরে পাওয়া, কেউবা বলছেন এটি নিজেকে মুক্ত আকাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়ানোর একটা উপলক্ষ্যের মাস। যে বিশেষণে বিশেষায়িত করা হোকনা কেন বিগত জুলাই অভ্যুত্থান ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক নতুন মোড়ের সূচনালগ্ন। তবে এটি কোন বহিঃশক্তির বিরুদ্ধে নয়, এটি ছিল দেশের ঘুনে ধরা ব্যবস্থার একটি গভীর রাজনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের লড়াই।

১৯৪৭ এর দেশ ভাগ থেকে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাঃ এ সময় পরিক্রমায় বার বার ক্ষমতার পালাবদল হলেও এ দেশের মানুষ কখনও স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে পারেনি বরং ক্ষমতাসীনরা প্রতিবারই নিজেকে স্বৈরাচার বানানোর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল তারই ধারাবাহিকতায় গত প্রায় দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে দেশে চলছিল মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ, গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ, ভিন্নমত দমনের কঠিন বল প্রয়োগ, এবং একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবর্তে নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার পাশাপাশি সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংসের মহাৎসব। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন যে পরাধীনতার শুরু, তারপর ১৮৩১ সালের ৬ ই মে বালাকোট যুদ্ধ, ১৮৫৭ সালের ১০ ই মের সিপাহি বিদ্রোহ, ১৮৩১ সালের তিতুমীরের আন্দোলন, ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান, ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে ২০২৪ সালের জুলাইয়ের আন্দোলন এ জাতীকে বারেবারেই মুক্তির আশা জাগিয়েছে। জুলাই অভ্যুত্থান ছিল সকল সিস্টেমের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ক্ষোভ। এই ক্ষোভ ফুঁসে উঠেছিল ২০২৪ সালের মাঝামাঝি, বিশেষ করে জুলাই মাসে, যখন সারাদেশে ছাত্র, তরুণ, শ্রমজীবী মানুষ, এমনকি সাধারণ নাগরিকরা রাস্তায় নেমে আসে।

ঢাকার শাহবাগ, চট্টগ্রামের ষোলশহর-২নং গেইট, রাজশাহীর সাহেব বাজার, সিলেটের বন্দর বাজার সহ দেশের সকল্প বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজের ক্যাম্পাসে দেখা যায় লাল-সবুজ পতাকা হাতে ছাত্ররা শ্লোগান দিচ্ছে, "কোটা না'মেধা "" মেধা, মেধা", "দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা, ঢাকা", দালালী না রাজপথ "তুমি কে আমি কে?" রাজাকার, রাজাকার" ।সহ আরও অনেক দ্রোহের স্লোগান।

এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল সরকারী চাকুরীতে কোটা প্রথার বিলোপ ও মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ ছাত্রদের যোক্তিক দাবিকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করার কারণে সে আন্দোলন শেষ পর্যন্ত কোটার দাবির পরিবর্তে এক দফা সরকারের পদত্যাগের দাবিতে পরিণত হয়।

ব্যাক্তিগত কিছু ঘটনা না উল্লেখ করলে এই লেখাটা অসম্পূর্ণ মনে হবে বলে মনে হচ্ছে।

আমি নিজেও দীর্ঘদিন একজন সরকারি চাকুরী প্রত্যাশী ছিলাম। কিন্তু তিনবার সরকারি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও শুধু রাজনৈতিক বিবেচনায় চূড়ান্ত নিয়োগ থেকে বাদ পড়ার দরুন ২০২৪ এ এসে সরকারি চাকুরীর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছিলাম। তাছাড়া আমার সরকারি চাকুরিতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বয়স ছিল ০৭ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত। তাই,, ইতোপূর্বে ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেও ২০২৪ এর আন্দোলনে অংশগ্রহণের তেমন কোন আগ্রহ ছিলনা।

জুলাই ১৮,২০২৪ ইং তারিখে আমার জুলাই অভ্যুত্থান আন্দোলনে প্রথম সম্পৃক্ত হওয়া। ঐদিন ২ নং গেইটে ছাত্রলীগের সাথে সাধারণ ছাত্রদের ভয়াবহ সংঘর্ষ হয় সন্ত্রাসীদের গুলিতে এবং রামদা, চাপাতির আঘাতে অনেকেই আহত হয়ে হাসপাতালের দিকে ছুটছিল। মেডিক্যাল প্রফেশনের সাথে যুক্ত থাকায় এবং ছাত্রসংগঠন সাবেক দায়িত্বশীল হওয়ার দরুন উর্ধতন সংগঠন থেকে আহত ছাত্রদের দেখভাল এবং আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছাত্রনেতাদের সাথে সমন্বয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত হই। ১৮ জুলাই চট্টগ্রামে ৩ জন মুক্তিকামী শহীদ হন। শহীদ ওয়াসিম আকরাম, শহীদ ফয়সাল আহমেদ শান্ত, শহীদ ফারুক। শহীদ শান্ত আমার পূর্ব পরিচিত হওয়ায় তার আহতের খবর শুনে এবং অন্যদের চিকিৎসা তদারকির জন্য একজন সহকর্মী নিয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেলে ছুটে যাই। গিয়ে দেখি অগণিত আহতদের পাশাপাশি শহীদ শান্ত সহ তিনজন ইতিমধ্যে শাহাদাত বরণ করেছে। শহীদের স্বজনদের আহাজারিতে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠছিল। শহীদ শান্তের আম্মুকে তখনও বিশ্বাস করানো যাচ্ছিলোনা যে তার আদরের "শান্তমণি" আর নেই। শহীদের লাশ বুঝে নিতে গিয়েই শুরু হলো তৎকালীন প্রশাসনের আরেক নির্মম নাটক মঞ্চায়ন। প্রথমে প্রশাসন থেকে জানানো হলো যার যার গার্জিয়ান লাশ বুঝে নিতে পারবে। তখন রাত প্রায় ৮:০০ টা, মুয়াজ্জিন এশার আযান দিচ্ছেন। যখন গার্জিয়ান উপস্থিত হলেন তখন বলা হলো তৎকালীন পাঁচলাইশ থানার ছাড়পত্র ছাড়া লাশ হস্তান্তর করা যাবেনা। কোন প্রতিনিধি যেনো থানায় পাঠানো হয়। শহীদ শান্তের মা সহ আরও কয়েকজন মিলে গেল ছাড়পত্রের জন্য। থানায় তাদেরকে প্রায় ২ ঘন্টা বসিয়ে রেখে বলা হলো ওসি

নিজে যাবেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ওসির উপস্থিত হওয়া ছাড়া লাশ হস্তান্তর করা যাবেনা। এভাবে সময় ক্ষেপণ করতে করতে বাজলো রাত ১১:০০ টা। ভবিষ্যতে যাতে এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিচার হয় তার প্রমান রাখার জন্য আইনজীবীর পরামর্শে আমরা লাশের পোস্টমর্টেম চাইলাম। কিন্তু প্রশাসন বললো কোন পোস্টমর্টেম হবেনা, লাশের জানাযা দিতে চাইলে এখনই জানাযার ব্যবস্থা করতে হবে... নাহয় তারা নিজেরা গিয়ে কবর দিয়ে আসবে। এমতাবস্থায়, শহীদ শান্তের শহরের বর্তমান ঠিকানায় গভীর রাতে জানাযা দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হলো তখন শুরু হলো আরেক টালবাহানা... লাশের পোস্টমর্টেম লাগবে। তখন রাত ১:০০ টা চট্টগ্রাম মেডিকেলের ইমারজেন্সির সামনে শহীদের কয়েকজন স্বজন আর আমরা কিছুসংখ্যক ছাড়া আর কোন লোকজন নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বুঝতে পারলাম বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা এবং আওয়ামী দলীয় লোকজনের আনাগোনা অনেক বেড়ে গেছে এবং অনেকটা আমাদেরকে ঘেরাওয়ের মতো করে ফেলছে। তৎক্ষণে আর বুঝতে বাকি রইলোনা লাশ দেওয়ার জন্য কেন এতো তালবাহানা চলছে। ইতোমধ্যে খবর পেলাম শহরের বায়তুশশরফ মাদ্রাসাসহ, বিভিন্ন মেস, বাসা-বাড়ি থেকে গণগ্রেফতার শুরু হয়েছে এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আসার প্রায় সবগুলো রাস্তার মোড়ে একাধিক তল্লাশি চকি বসানো হয়েছে। রাত প্রায় ৩:০০ টা, পাঁচলাইশ থানার একজন অফিসার এসে জানালেন লাশ শহরে জানাযা দেওয়ার অনুমতি নেই, সরাসরি গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে আমরা যেন এম্বুলেন্স ব্যবস্থা করি। আমাদেরকে এই দিকে ব্যাস্ত রেখে তারা নিজেরাই কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় লাশ গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা করলো। শহীদের সাথীদের কাউকেই শেষ দেখা দেখার সুযোগ দেওয়া হয়নি। লাশ নিয়ে যাওয়ার পর শুরু হয় গণ গ্রেফতার, জরুরী বিভাগের সামনে যারা ছিল তার মধ্যে বেশ কয়েকজন বিনা অপরাধে গ্রেফতার হয়, যারা ৩৬ জুলাইয়ের পর কারাগার থেকে মুক্তি পায়। আর আমরা যারা জরুরী বিভাগের ভিতরে ছিলাম তারা সৌভাগ্যক্রমে গ্রেফতার এড়াতে সক্ষম হই। যখন বাসায় পৌঁছি তখন রাত প্রায় ৪:৩০। ২১ ডিসেম্বর পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে দীর্ঘতম রাত হলেও আমার জীবনে ২০২৪ সালের ১৮ জুলাই ছিল দীর্ঘতম রাত।

৩৬ জুলাইয়ের দ্বিতীয় স্বাধীনতার পর শহীদের ডকুমেন্টারি তৈরির একটা প্রজেক্টে যুক্ত থাকার সুবাদে চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল শহীদের পরিবারে সাক্ষাৎ এবং শহীদের করব জেয়ারত এর সুযোগ হয়।

দুই একজন ছাড়া প্রায় সকল শহীদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। অনেকেই স্কুল কলেজের গন্ডিও পার হতে পারেনি, অনেকে পড়াশোনার সাথে সম্পৃক্তও নয়। তবুও তারা এই আন্দোলনে প্রথম থেকেই সক্রিয় থেকে শেষ পর্যন্ত জীবন দিয়েছেন। পড়াশোনা, কর্মজীবন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা মিল না থাকলেও তাদের সকলের এক জায়গায় মিল ছিল আর তা হলো "ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা" এবং "একটি বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করার অংগীকার"।

যেসকল সম্ভাবনাময় তরুণ জুলাই অভ্যুত্থানে শাহাদাত বরণ করেছেন এবং আহত হয়েছেন তারা, আমরা যারা সুস্থ হয়ে বেঁচে আছি এবং মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করছি তাদেরকে ঋণী করে গেছেন। শহীদের পক্ষ থেকে বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার এই অর্পিত দায়িত্ব আমরা যেন ভুলে না যাই। এবার যদি আমরা তারুণ্যের রক্তের সাথে গাদ্দারী করি তাহলে হয়তো আবারও কোন এক স্বৈরাচারী, অত্যাচারী শাসক আমাদের শাসন করবে এবং এ জাতীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা অধরাই থেকে যাবে। মহান আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ তিনি যেন এ জাতির কর্ণধারদের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন এনে দেন।

জুলাই-বিপ্লবে বীর চট্টলা

- মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন আজাদ
বিবিএস (অনার্স), এমবিএস (ব্যবস্থাপনা)
এলএলবি, পিজিডি (এইচআরএম)

আন্দোলনে উত্তাল চট্টগ্রামের রাজপথ:

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই মূলত ক্যাম্পাসে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। ২০২৪ সালের ৬ জুলাই চট্টগ্রাম নগরীতে কোটাবিরোধী শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ কর্মসূচি করেছিলেন। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক অবরোধও করা হয়। তবে নগরীতে আন্দোলন জোরদারে ভূমিকা রেখেছিল ৭ জুলাইয়ের 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচি। সেদিনের 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচির মাধ্যমে চট্টগ্রাম নগরীতে আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে।,

৬ জুলাই, বিকেল ৪টার দিকে প্রথমে নগরীর ষোলশহর রেলস্টেশন থেকে মিছিলের মধ্য দিয়ে এ কর্মসূচি শুরু করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। তবে শিক্ষার্থীদের রেলস্টেশনের মূল ফটকেই আটকে দিয়েছিল পুলিশ। এ সময় শিক্ষার্থীরা পুলিশের উদ্দেশ্যে 'ভুয়া' স্লোগান দেন। কিছুক্ষণ পুলিশের সঙ্গে তর্কাতর্কির পর শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে দুই নম্বর গেট এলাকায় যান। শিক্ষার্থীরা সেখানে কোটাবিরোধী বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড নিয়ে অবস্থান করেন। প্রায় এক ঘণ্টা অবস্থা নিয়ে তারা কোটাবিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দেন। এ সময় সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এরপর দুই নম্বর গেট থেকে মিছিল নিয়ে লালখান বাজার এলাকায় গিয়ে সন্ধ্যায় সেদিনের মতো কর্মসূচি শেষ করেন কোটাবিরোধী শিক্ষার্থীরা। সেই কর্মসূচিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নগরীর বিভিন্ন কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরাও অংশগ্রহণ করেন।

৭ জুলাই, বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচির মধ্য দিয়েই চট্টগ্রাম নগরীর ষোলশহর এলাকা কোটাবিরোধী থেকে বৈষম্যবিরোধী এবং একপর্যায়ে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আন্দোলনের মূল ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। কোটাবৈষম্য নিরসনের এক দফা দাবিসহ সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচিতে হামলার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে চট্টগ্রাম নগরীতে এবার আড়াই ঘণ্টা হেঁটে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন শিক্ষার্থীরা।

আন্দোলনে উত্তাল চট্টগ্রামের রাজপথ:

১২ জুলাই, শুক্রবার বিকেল পাঁচটার দিকে নগরীর ষোলশহর স্টেশন থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেন প্রায় হাজারখানেক শিক্ষার্থী। মিছিলটি দুই নম্বর গেইট, প্রবর্তক মোড়, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চকবাজার, জামালখান, কাজির দেউড়ি, লালখান বাজার, জিইসি হয়ে সাতটা ৪০ মিনিটে ষোলশহর স্টেশনে গিয়ে শেষ হয়। এরপর শিক্ষার্থীদের ষোলশহর রেলস্টেশনের দুই পাশে অবস্থান নিতে দেখা গেছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' এর ব্যানারে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এতে পোর্ট সিটি বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ, হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজসহ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) অধিভুক্ত অন্যান্য কলেজের পাশাপাশি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরাও মিছিলে যোগ দেন।

মধ্য জুলাইয়ে পরিস্থিতি মারমুখী হয়ে ওঠে। ১৬ জুলাই, মঙ্গলবার সকাল থেকে সারা দেশের মতো চট্টগ্রামে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিকেল ৩টায় চট্টগ্রামের মুরাদপুরে জড়ো হন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে হঠাৎ করে ছাত্রলীগ-যুবলীগের নেতা-কর্মীরা তাঁদের ওপর চড়াও হন। এসময় দুইপক্ষই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। একপর্যায়ে ছাত্রলীগ-যুবলীগের কর্মীরা পিছু হটলে শিক্ষার্থীরা এলাকাটি নিয়ন্ত্রণে নেন। পিছু হটে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা দুই নম্বর গেট এলাকায় একটি বাস ভাংচুর করে। পরে মুরাদপুর, ২ নং গেট ও ষোলশহরের আশপাশের এলাকায় কোটা আন্দোলনকারীদের সাথে ছাত্রলীগ-যুবলীগ ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের সময় পুলিশের সাথে সাদা পোষাকের কয়েকজন অস্ত্রধারীকে গুলি ছুড়তে দেখা যায়। বেশ কিছু ককটেলও বিস্ফোরণ ঘটায়। আন্দোলনকারীরা ছত্রভঙ্গ

হয়ে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি শুরু করে। পরে তারা ইট পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। এভাবে অনেকক্ষণ চলতে থাকে ধাওয়া-পাল্টা-ধাওয়া। পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। শিক্ষার্থীদের অনেকে অলিগলিতে ঢুকে পড়লে সেখানেও খুঁজে বের করে হামলা করা হয়। দফায় দফায় সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়।

সংঘর্ষের সময় কোটা আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে যুবলীগের ক্যাডার একজন প্রকাশ্যে গুলি ছুঁড়ে। পুলিশ ও আওয়ামী সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয় চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র ওয়াসিম আকরাম, চট্টগ্রাম নগরের ওমরগণি এমইএস কলেজের ছাত্র ফয়সাল শান্ত এবং ফার্নিচার দোকানের কর্মচারী মোহাম্মদ ফারুক। আহত অবস্থায় অন্তত ২০ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়। চট্টগ্রামে নিহত তিনজনই বুকের বাঁ পাশে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বলে নিশ্চিত করেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ তসলিম উদ্দিন। ১৮ জুলাই (বৃহস্পতিবার) বহদ্দারহাটে সংঘর্ষে আরও তিনজন নিহত হন। তাঁরা হলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র হৃদয় চন্দ্র তরুয়া। আরেকজন তানভীর আহমেদ, তিনি আশেকানিয়া ডিগ্রি কলেজের মানবিক বিভাগের ছাত্র ছিলেন। অপরজন সাইমন হোসেন, তিনি নগরের বহদ্দারহাটে একটি মুদি দোকানে কাজ করতেন। এভাবে আন্দোলন ধীরে ধীরে সহিংস হয়ে উঠলেও দমে যাননি স্বৈরাচারবিরোধী অকুতোভয় এ বীর সেনানী। বরং অন্য সহযোদ্ধাদের মতোই আরো বেশি সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

৪ আগষ্ট, শনিবার এক দফা ঘোষণার পরে ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে নামার ঘোষণা দেন নগর আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন প্রথমে দুপুর আড়াইটায় নিউমার্কেট মোড়ে অবস্থান কর্মসূচি ঘোষণা করে। এরপর একই স্থানে দুপুর ১টায় অবস্থান কর্মসূচির ঘোষণা দেয় নগর আওয়ামী লীগ। রাতে নিজেদের সময় পরিবর্তন করে বেলা ১১টা থেকে নিউমার্কেটে অবস্থানের ঘোষণা দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা। সকাল ১০টা থেকেই নিউমার্কেট এলাকায় বিক্ষোভকারীরা জড়ো হতে শুরু করে। সেখানে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষকেও অবস্থান করতে দেখা যায়। সকাল ১১টার দিকে পুলিশ টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়লে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়, যা পরে সংঘর্ষে রূপ নেয়। এর মধ্যে নিউমার্কেট মোড় এলাকায় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের কর্মীরা অবস্থান নেন। সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে নিউমার্কেটসহ এর আশেপাশের এলাকায়। সেদিন সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ না থাকলে পুলিশ ও আওয়ামী সন্ত্রাসীদের গুলিতে শত শত ছাত্র-জনতা শাহাদাত বরণ করতেন।

৩৬ জুলাই

- ডাঃ মোহাম্মদ নাজমুল হুদা রিপন
সহযোগী অধ্যাপক, শিশু স্বাস্থ্য বিভাগ

আগস্ট মাসের খুশির কথা কি বলিব আর,
শেখের বেটি পালিয়ে গেলো দেশ ছেড়ে ওপার।
ষোলো বছর খেললো শুধু দানব দানব খেলা,
গুম খুন আর অত্যাচারের হিসেব ছিলো ম্যালা।
কথা বললেই যখন তখন ধরতো চেপে গলা,
উন্নয়নের জোরে তখন দেশের খালি তলা।
রাজাকারের বাচ্চা বলে যেই না দিলো হাঁক,
আনলো ডেকে নিজের বিপদ বাকী কথা থাক।
রক্তে যাদের আগুন জ্বলে উঠলো তারা জেগে,
সেপাইদের বন্দুকের গুলি ছুটলো তীরের বেগে।
অর্ন্তজাল বন্ধ করে যায় কি জোয়ার রেখো,
মন্ত্রী-সান্ত্রী কাঁপছে ডরে দেশ হয়ে যায় ফাঁকা।

ছাত্র জোয়ান আম জনতা উঠলো জেগে দেশে।
জীবন দিলো মুগ্ধ সাঈদ দেশকে ভালোবেসে।
হাজার শহীদের রক্তে ভেজা নুতন এক বাংলা,
জঞ্জাল সব সরিয়ে এবার নূতন পথে চলা।
আর চাই না ফ্যাসিবাদ সোনার এই বাংলায়,
প্রাণের চেয়ে প্রিয় সবার ৩৬ জুলাই,
হাজার শহীদের ঝরা রক্তে ফ্যাসিস্ট হলো বিদায়,
মহান এ ত্যাগের কথা কখনও কি ভোলা যায়।

জুলাই চিরন্তন

- ডা. শেখ মোহাম্মদ ইরফান
সহকারী অধ্যাপক, ফরেনসিক মেডিসিন

জুলাই এসেছিল ঝড় হয়ে
আকাশে নেমেছিল বজ্রের গান
রংপুর হতে বীর চট্টলা হয়ে
জেগেছিল পথ জেগেছিল প্রাণ
কে ছিলনা এই মিছিলে?
সাঈদ-মুগ্ধ, ফয়সাল-শান্ত
ছিল ডাক্তার সাথে রক্তাক্ত অম্লান
প্ল্যাকার্ড হাতে শিক্ষার্থী - চোখে রঙিন স্বপ্ন
কেউ এসেছিল গ্রাম থেকে কিংবা নগরীর ব্যস্ত মোড়ে
কেউ বুক পেতে দিয়েছিল ভিসি চত্বরে
কারো রক্তে লাল হয়েছিল জুলাইয়ের রাজপথ
কেউ দিয়েছিল সিংহের ডাক - বুক পেতেছি গুলি কর
হায়দারী ডাক ছড়িয়ে পড়ে বাংলার পথে প্রান্তরে
জালিমের মসনদ ফেংগে হয়ে যায় শ্মশান
উৎসর্গ হয় জান, ফিরিতে দেয় প্রাণ
অঝোরে বৃষ্টি নামে, আকাশ কাঁদে বিজয়ে
জুলাই মানে আর কোন মায়ের বুক খালি না হওয়া
জুলাই মানে কোন তরুণের স্বপ্ন ঝড়ে না যাওয়া
জুলাই মানে চাইনা কোন স্বৈরাচার
চাইনা গুম, খুন, আর জালিমের আয়নাঘর।

একটু সময় হবে?

- আবদুর রহিম
সহকারী পরিচালক, এলএমডি

কখন তোমার ভাঙবে ঘুম
জাগবা তুমি কবে?
জাগলে তুমি হাজার রুমি
মিছিলে যোগ দেবে।

এই মিছিলে মালেক আছে
হাত বাড়িয়ে রবে
ভালোবাসার ডালা দিয়ে
মন রাঙিয়ে দেবে।

কখন তোমার আসবে হুঁশ
সজাগ হবা কবে?
তোমায় দেখে লক্ষ শিশু
শক্তি সাহস পাবে।

অন্ধ, বধির, কালা তুমি?
হৃদয়ে দিলে তালা?
অন্ধকারের সব গলিতে
তোমার হাঁটা চলা!!
তোমায় তুমি চিনলে না যে
চিনবা তবে কবে?
বিদায় বেলায় বলবে কি না
একটু সময় হবে?

পাঞ্জেরীরা ডাকছে তোমায়
দীন কায়েমের পথে
সেই পথে তো জীবন আছে
কুরআন আছে সাথে।

একটু যদি দাও গো সময়
হাজার সময় হবে
চোখ বুজিলে দেখবা তুমি
কী করিলা ভবে!!!

জুলাই ৩৬

- আবু ফাহাদ
ওয়ার্ড বয়, শিশু বিভাগ

স্বৈরাচারের বিষের দাঁতে
মায়ের বুকটা শেষ,
বীর শহীদের রক্তে এলো
সোনার বাংলাদেশ।

মীর মুগ্ধ ধরলো বাজি
আমার জীবন নে,
এই জীবনের বিনিময়ে
স্বাধীন বাংলা দে।

ঝাঁপিয়ে পড়ে ওয়াসিম
বুকে নেইকো ঢাল।
রাজপথ রাঙিয়ে গেলো
বুকের রক্তে লাল।

মা খুঁজে এদিক সেদিক
ভাত বেড়েছে হায়।
হঠাৎ যেনো জানতে পারে
খোকন যে তার নাই।

ভয় করেনি শ্রমিক যুবা
রিকশাওয়ালা মামা।
স্বৈরাচারের বিষের মুখে
ঘষে দিলো ঝামা।

রাজপথে আজ তরুণ যুবার
বুক চিতানো বুলি।
দুগ্ধপায়ী শিশুর বুকে
লাগলো ছুটে গুলি।

ভাই মরেছে বোন মরেছে
বিলিয়ে দিলো জান,
ঘরে থেকেই শহীদ হলো
নিষ্পাপ আয়মান।

মৃত্যু মোদের সঙ্গী হলো
মৃত্যুতে নাই ভয়,
নিয়ে আসবো স্বাধীনতা
হবে জনতার জয়।

স্বাধীন হলো এদেশ আবার
নির্ভেজাল আর খাঁটি।
যতই আসুক নব্য পিশাচ
রক্ষা করবো মাটি।

Rebirth: A New Sun

- Mohammad Imam Uddin
Admin Officer, HRD

Seventy-one returns
In twenty twenty-four
Seventy-one returns
In the glow of valor.

36 July arrives
With the trumpet of new age realization
The frenzied streets, filled with students and the public
Pave the eternal way of revolution.

Hindu-Muslim-Buddhist and Christian
Revived in the single tone,
From the homeland of harmony
Let tyranny be overthrown.

The allies of fascism
Have inflicted wounds everywhere
Now the protestors have turned around
Before who wouldn't even dare.

A new call for freedom
A hope in the clear skies-
Today,
The homeland has been restored
The nation beholds--
A new sunrise.

স্টেথোর আড়ালে, নীরব ক্লান্তি স্পন্দন

- আবদুল্লাহ আল রাসেল
ব্যাচ: ১০ম, রোল: ৫০

ভাইভা ঘরের কাঁপন ভরে, হঠাৎ থেমে যায় জিব,
শব্দগুলোর মাঝে হোচট খায়,
হারায় সব জ্ঞান ও বিশ্বাসের তীব!
প্রশ্নেরা আসে তুফানের মতো, ঠাস করে বাজে,
মন বলে-
"এ জীবন বুঝি শুধুই ক্ষয়, শুধু ব্যর্থতার সাজে।"

চোখের কোণে জমে যায় নিঃশ্বাস, বুক জুড়ে চাপ,
স্বপ্নগুলো এখন সন্ন্যাসী, বাঁচে না কোন আশার ভাঁপ।
অবহেলা থেকে হোচট খাই,
আমার একতরফা ভালোবাসার ভুল বোঝা,
মানুষেরা ভাবতে থাকে-
"এ তো কেবল ব্যর্থতা, নিস্প্রাণ ঘৃণার বোঝা!"

কেউ বোঝে না বুকের মাঝে চাপা কান্নার সুর,
কত চেষ্টা ঝরে গেছে, হারিয়ে নিঃশব্দ ভোর।
তাদের হাসি কাটে মনে, লাগে বিষের দংশন,
নিজেকেই ঘৃণা করি, চুপে পুড়ি, থনথন!

তবু বুকের ভেতরে কোথাও বাজে এক সুর,
এক মুহূর্তে শোনে মন-
"শুরু করো আবার,
হারিয়ে যেও না, যাও যাওয়া যায় যত দূর"।
ভুলগুলোই শিখিয়ে দেয়, ক্ষতির মধ্যেও থাকে লাভ,
কঠিন পথে হারানো মানুষগুলোও ফিরে পায়
সাহসের ধ্রুবতারা, শক্তির আবির্ভাব।

হতাশার সুর আর কান্না সত্ত্বেও হৃদয় বলে,
"আমি যাব, আবার সঠিক পথ খুঁজে পাবে,
আমাকে আর থামাবে না কেউ,
বিশ্বাস আসমানের রবে"।
রাত যতই গভীর হোক, আশার প্রদীপ জ্বলে,
একদিন ঠিক দাঁড়াবো আমি, জীবন রঙিন তলে
ভেতর থেকে ওঠে এক কান্না চাপা গান-
"হারিয়ে নয়, শিখে আবার সাজাবো প্রাণ"।

ভুল বোঝা মানুষদের হাসি এখন আর কষ্ট দেয় না,
নিজের ভুলগুলো ঠিক করতে করতে,
একদিন হাসবো আমি,
পরের কথা দুনিয়ার ছলনা।
জীবনের পথে ক্ষয় হতে হতে,
ফোটে নতুন প্রভাতের রাগ,
হৃদয়ে আবার আগুন জ্বলে,
শুরু করি নতুন এক সকালের পরাগ।

ভেতর থেকে বাজে এক করুণ সুর,
বলেঃ "হারিয়ে যেও না, আলো এখনো দূর"।
ভুল হোক, ব্যথা আসুক, ভয় যতোই শাসাক,
আমি আবার জাগবো, সে-আমি আবার
জীবন আঁকবো রঙে রঙে হাসাক।

মৃত্যু

- মোহাম্মদ আলমগীর
এমবিবিএস, ১০ম ব্যাচ

গগনের শেষ প্রান্তরে ছুটে চলা এক বিকেল বলে,
পূর্বের আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা ছিল বলে,
একদিন সবকিছু শেষ হবে জেনে,
আমি কখনো দাঁড়াইনি আউশের ক্ষেতে,
হুতোম পেঁচার ডাকে কখনো বসি নাই নির্জন পুকুর ঘাটে।

এই রক্তিম আলোর রাঙা ভোর,
বর্ষায় কাঁদা মাড়ানো এক দুপুর,
একদিন সবকিছু শেষ হবে জেনে,
আমি তো লাটাই হাতে মাড়াইনি কোন তেপান্তরের মাঠ
আমি তো শুনি নাই কোন পানকৌড়ির ডাক।

আমি বিচলিত,
বিকেলে নীড়ে ফেরা পাখির সারি,
রোদ্দুর মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা সুপারি গাছ দুটি,
এই বট বৃক্ষের তক্ষকের ডাক বুঝি
পারিবে না আগলে রাখতে।

আসি বিচলিত বলে,
বিকালের সূর্য লুকিয়ে ছিল মেঘের পানে,
নদীর তীরে ঢেউয়ের মধুর শব্দে
ঐ নিশি রাতের তারার মেলা বুঝি,
পারিবে না আমায় আগলে রাখতে।

আমি বিচলিত ছিলাম বলে,
মুয়াজ্জিনের মধুর ডাকে ঘুম ভাঙ্গে
বাঁশের ঝাড়ের কোলাহল মিলিয়ে যাবে,
পুকুরের হিমেল পানির ঠান্ডা হাওয়া বুঝি,
পারিবে না আমায় আগলে রাখতে।

আমি জানি,
এই তিমির ঘর বুঝি পারিবে
আমায় তাহার করে রাখতে,
তাই আমি আজ সবকিছু ছেড়ে মৃত্যুর প্রহর গুণি।

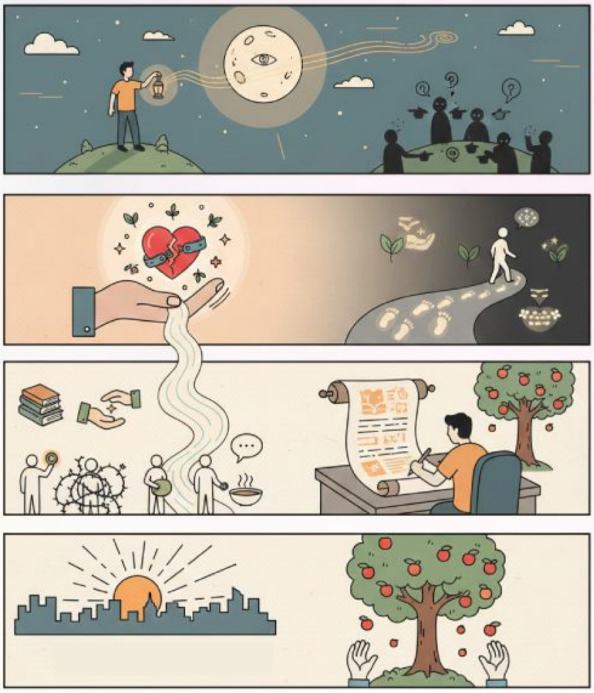

সুখের সাথে কানামাছি খেলা

- আকিবুল ইসলাম তকী

সবই তো আজ হারিয়ে!
কখনোবা ভাবি আমি দূর আকাশে তাকিয়ে।
ভাবি, এই আকাশও কেনো আজ এতই অপরিচিত?
যেই আকাশে হরেক রকম মেঘরা হানা দিতো।
যে আকাশে রাতের বেলা চাঁদ ও তারার খেলা;
আর নিচে তা দেখতে হতো হাজার শিশুর মেলা।
পূর্ণিমা রাত ভরতো আলোয়; উঠোনেতে সবাই।
সেই একতা সামাজিকতা হারিয়ে গেলো কোথায়?
চাঁদের আলোয় কথা হতো; চলতো লুকোলুকি।
হঠাৎ সবে লুকালো কোথায় শুন্যতারে রাখি?
হারিকেনের আলোয় কত হাজার গল্প করা।
কোথায় আজ সে ভালোবাসা, দাদীর হৃদয় ভরা?
জানি ফিরে আসবে না সেই স্বচ্ছ ভালোবাসা।
তার বদলে থাকবে মনে অপূর্ণ সব আশা।
তবুও ভুলা যায় কী কভূ আম-জাম ও রস-কষ।
আক্‌কুম বাক্‌কুম, আকাশে তে লক্ষ তারা র যশ।
আকাশ পানে তারা গুনে হয় না কেউ আর জয়ী।
তারা রা ও একাকী আজ, আনন্দ শয্যাশায়ী।
তাইতো এসব স্মৃতিতে নিয়ে আজ খেলি কানামাছি।
সুখ বলে, "আয়, ধরে দেখা! এই তো আমি আছি!"

মন ও মনুষ্যত্ব

- আকিবুল ইসলাম তকী

অন্যে যা খুশি বলুক,
তোমার মনের ইচ্ছা - লক্ষ্য পূর্ণোদ্যমে চলুক।
তোমার ই মনেতে শুভ ইচ্ছা যা, শুভ কথা-কাজ-বাণী;
যার ই আগে চলে সমালোচনা প্রবল আঘাত হানি;
যার ই মহত্ত্বে ঈর্ষান্বিত কিছু লোক, আরও যারা
ভুল-ত্রুটি আগে খুঁজে নিয়ে করে ঠাট্টা ও মশকরা।
সব বাধা আর বিপত্তি ঠেলে এগিয়ে চলো সে লক্ষ্যে।
সন্দেহ কভু হলে নিজ হাত রাখো নিজের ওই বক্ষে।
ভাবো, তব কেনো সন্দেহ হয়, কেনইবা এত ভয়।
সবকিছু বুঝে, সদুপায়ে যুঝে, করো সেসবের লয়।
সেসব কেমন লাজ?
যেই লাজে পুড়ে মরে ছারখার পূণ্য-মহৎ কাজ।
যেই লাজে সদা-সর্বদাই দরিদ্র প্রতারিত;
যেই লাজে আজ চরম খারাপও হয়ে যায় অতি হিত।
যেই লাজে কভু নিষ্পাপ-রাও আহত পড়িয়া রয়,
সাহায্য কিছু না পেয়েই কভু মৃত্যু সপিতে হয়।
ধিক্কার সেই মানবের প্রতি, এমন লাজ যে রাখে।
অপরের কথা না ভেবে যে মনে স্বপ্নের দেশ আঁকে।
আরও আছে কিছু, যারা অপরের আয়ু নিয়ে করে খেলা।
নিজেরও যে এক আয়ু আছে কভু ভাবে না তা এক বেলা।
এমন ই যেসব মানুষ সমাজে মনুষ্যত্বহীন,
সময় থাকতে, জনসম্মুখে, করো তাদের বিলীন।
তবেই সবার স্বপ্ন দেখা সম্ভবপর হবে।
তবে ই সফল হবে সকলে, ইতিহাস সাক্ষী রবে।
এখন তো সময় এই,
যে কাজ করিবে, নানাভাবে তুমি ফিরে ফল পাবে সেই।

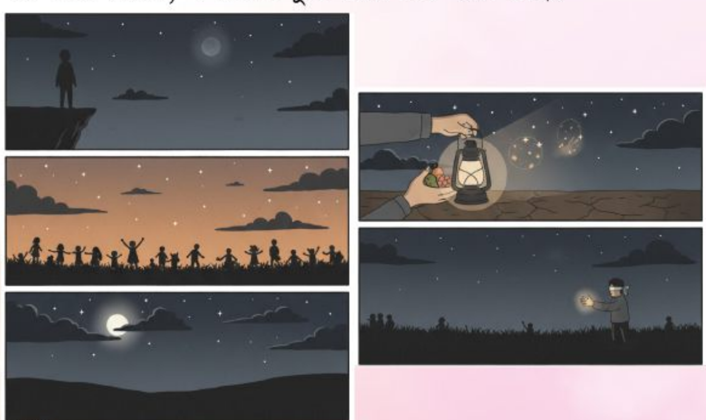

অধমের প্রার্থনা

- কাজী মোঃ মুয়াজ
এমবিবিএস, ১০ম ব্যাচ

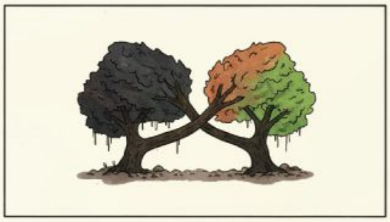

আমি জন্মের ব্যাথা বেদনা বইতে বইতে
রাতের আঁধারের দ্বার প্রান্তে পৌঁছিয়াছি।
মেনে নেওয়ার শেখরে উঠিতে উঠিতে
কত পর্বত শৃঙ্গ পার করিয়া আকাশ ভেদিয়াছি।

কত অদৃশ্য অশ্রু বর্ষনে
ভিজিয়াছে রাতের জায়নামাজ।
স্রষ্টার সঙ্গ পাইবার তরে
পার করিয়াছি কত বিনিদ্র রাত।

প্রভু মোর দেখিছে রাতের দীর্ঘশ্বাস,
দেখিছে মোর ক্লান্ত দুপুরে চাপা আর্তনাদ,
ছায়াতল তাঁর পাইবার আশে কাটে বারো মাস,
ধৈর্যের পাথার গড়িয়া পার করিতেছি দিন অবসাদ।

পাপের পাহাড় মোর বিশাল আমি জানি
তবু তিনি দয়াময় বিনাবাক্যে মানি।
অগণিত বার গগনে খুঁজিয়াছি তাঁরে একা
পাপের ঘন মেঘ মোরে দেয় না তাঁর দেখা।

জীবন যুদ্ধে হারিয়া কত ছাড়িয়াছি আশা,
আঁধার মোর ফুরোয় না তবু তিনি শেষ ভরসা।
যদি না থাকিত নফস না থাকিত ক্ষুৎ পিপাসা,
দূর অজানায় হারিয়ে নির্জনে বাঁধিতাম বাসা,
নিভৃতে বসে সেজদায় পড়ে চাহিতাম ভালোবাসা।

হাজারো প্রেমিক তাঁর কাঁদিছে আঁধার রাতে
এত প্রেমিকের মাঝে এ অধম কাঁদে সন্ধ্যে রাত প্রাতে

আমি শান্তির খোঁজে নশ্বর পৃথিবী ঘুরিয়াছি একা;
আমি ক্লান্ত জীর্ণ অসহায় পথিক হে প্রভু,
এই অধমের অন্তরে দাও তুমি দেখা।

আমি চির শান্তির পথ ছাড়িয়া
রঙিন মরিচিকায় হারিয়াছি পথ বহুবার।
তবু দয়াময় এই অধমেরে টানিয়াছ কাছে,
সাধ্য নেই মোর তার পূর্ণ শোকর করিবার।

দুনিয়া, স্বর্গ নরক কোথা আমি নাহি জানি
শুধু প্রভু তোমার ছায়ায় বাঁচিতে চাই
বাড়িয়ে দাও তোমার দয়ার পাণি।

হৃদয় মোর অধীর, তবু তোমারই ধারে
পানিতে শীতল শান্তি হোক আমার সব ক্ষত ভারে
তোমার নামেই আমি সার্থক প্রভু,
শুধু তোমারি ছায়ায় বাঁচি
এ জীবন পূর্ণ করো, সফল করো পরপারে।

জীবন

- মোঃ আরকানুল ইসলাম চৌধুরী
এমবিবিএস, ৯ম ব্যাচ

একদিন নয়, দুদিন নয়
প্রতিদিনের এই খেলায়,
জীবন যেন নাগরদোলা
এই পৃথিবীর হট্টমেলায়।

উঠছে কখন, নামছে কখন
থাকছে কখন সমতলে,
বিনা টিকিটে চড়ছে সবাই
মাপা সময় এগিয়ে চলে।

সময় সবার বাঁধাধরা
এমনি করেই বাঁচি আমরা,
রাখছি আশা পূর্ণ হবেই
আজ অথবা আগামী ভোরে।

জীবনের অলীক কথামালা
লিখছো দিবস রাতে
কে চেয়েছে অলীক গল্প;
অনাহূত ভাবনায় জড়াতে।

তবু কেন হঠাৎ বিষাদে মলিন
মেখেছ জটিল বেদনাভার,
দু'চোখে অবাক পরিভাষা
জানতে চায়, তুমি কার!

আলোয় বেঁধেছি তোমাকে
রেখেছি পুষ্পের প্লাবনে,
এই বন্ধন ভালবাসার মেদুরতায়
নির্ভার, বিরূপ ক্ষণেক্ষণে।

The Irresistable War

- Tahamina Akther Yemo
Roll: 04, 7th batch

The little boy walking with his mother hand in hand
Asked with a curious gaze, where lies his true land?
The mother with a soft and gentle look on her face
Told her son to quicken his pace
The son did not quicken his pace
The mother asked if he wanted to join the race?
Something bright danced in the boy's eyes This time it wasn't the usual flies
"Ma" cried the boy "when I grow up I want to..."
The mother closed the lips "your not going to"
By saying this, her eyes were filled with tears
She did not want the return of her long hidden fears
She questioned herself, why is it always her family on this?
It was a dream for her a family with bliss.
She daren't look at her son
'Coz he will see her groan.
She thought of the days
When she was a young girl and collected hays
That time she had everything to live for
But now she awaits for her only son by the door
She wants to protect him, but how?
'Coz war is the only reason now
Men are giving to war themselves raw
To protect their families and their paws

Days passed as the mother grew older
And her son grew young and bolder
One morning the mother awoke to find her son's bed empty
Still warm and showed it was left only few moments ago
Why there are wars? Thought the mother
Is it to take away an innocent boy's father?

Or to take away a child's sisters and brothers?
She was grateful that her son had never seen her crying
Or else he would have cried while leaving
She made up her mind to wait as she sat by the door
And stared into the emptiness of the vast moor
Something was pinching her that her son would die in her lap
with dignity
Assuring her nation unity and integrity
She remembered once telling her son that he belonged to no land
His sole responsibility was to lead everyone to a safe haven
hand in hand
Why hadn't she remained a maiden? She thought
Fighting back tears she remembered what she was taught
Days passed and nights passed
It was too late to lament over the things that has happened
"Mother" as she heard the familiar voice once again
Moved swiftly towards the door with consciousness regained
The youth at the door cried, "the war is over mother"
The mother simply replied "you're late for supper"
Her face just flushed with joy, He was all in one piece, her dear boy

At night the lad laid his tired head on the lap of his mother
As this was the last time he could enjoy this privilege ever
"Mother" called the boy softly "before I go for my long sleep I
want to know something-
"Why didn't you stop me when I was going?"
The mother was surprised and taken aback
"I'm sorry mother, the war was irresistible
"Will you sing me the song I liked when I was little?"
The mother cried unashamedly as her son breathed his last on
her lap with dignity
Assuring her nation unity and integrity.

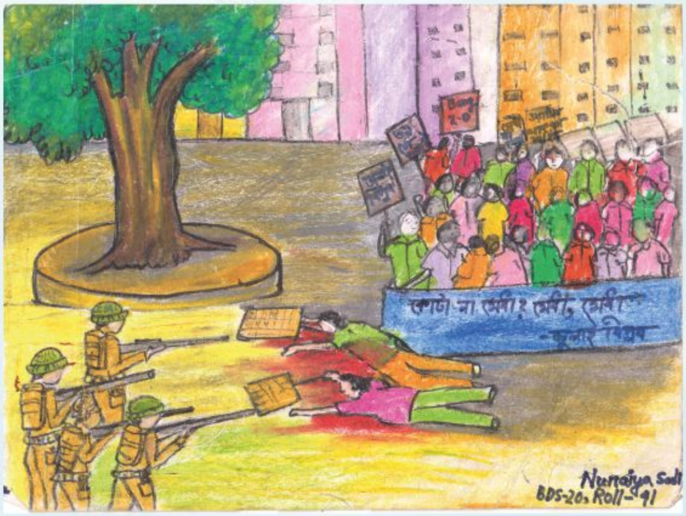

জুলাই আন্দোলনের খন্ডচিত্র

- নুরাইয়া সাদি
বিডিএস, ২০তম ব্যাচ
রোল: ৪১, সেকশন- এ

- শামিলা তাহজিব নাসির
১২তম ব্যাচ
রোল: ০৪, সেকশন- বি

- সাবিকাহ নুর
১২তম ব্যাচ
রোল: ৩২, সেকশন- বি

কৃতি শিক্ষার্থী

যারা অনার্স মার্কস পেয়েছেন

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৩-১৪

প্রথম পেশাগত পরীক্ষা

মোহাম্মদ ইয়াছিন চৌধুরী
১ম ব্যাচ
বিষয়: এনাটমী

জান্নাতুল মাকাম
১ম ব্যাচ
বিষয়: এনাটমী

মাহাথির মাহমুদ আবির
১ম ব্যাচ
বিষয়: এনাটমী

তাসনিম আলী চৌধুরী
১ম ব্যাচ
বিষয়: এনাটমী

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৪-১৫

তৃতীয় পেশাগত পরীক্ষা

জান্নাতুন নাঈম মারিয়া
২য় ব্যাচ
বিষয়: মাইক্রোবায়োলজি

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৬-১৭

প্রথম পেশাগত পরীক্ষা

ইজাজ আহমেদ শামীম
৪র্থ ব্যাচ
বিষয়: এনাটমী

সরুপা কামাল উর্মি
৪র্থ ব্যাচ
বিষয়: এনাটমী

শারমিন জেসি
৪র্থ ব্যাচ
বিষয়: এনাটমী

সাইয়েদা জেরিন নুসরাত করিম
৪র্থ ব্যাচ
বিষয়: এনাটমী

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৬-১৭

প্রথম পেশাগত পরীক্ষা

উম্মে রুমান
৪র্থ ব্যাচ
বিষয়: এনাটমী

গার্গী ভৌমিক
৪র্থ ব্যাচ
বিষয়: এনাটমী

আনোয়ার হাসান সাকিব
৪র্থ ব্যাচ
বিষয়: এনাটমী

রিফা তাসনিম আইরিন
৪র্থ ব্যাচ
বিষয়: এনাটমী

আইমন নওশিন
৪র্থ ব্যাচ
বিষয়: এনাটমী

শারমিন আক্তার
৪র্থ ব্যাচ
বিষয়: এনাটমী

এলিজা ইয়াসমিন এনি
৪র্থ ব্যাচ
বিষয়: এনাটমী

মুহাম্মদ ওবাইদুল ইসলাম
৪র্থ ব্যাচ
বিষয়: এনাটমী

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-১৮

প্রথম পেশাগত পরীক্ষা

সামিরা
৫ম ব্যাচ
বিষয়: এনাটমী

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-১৮

দ্বিতীয় পেশাগত পরীক্ষা

সামিরা
৫ম ব্যাচ
বিষয়: কমিউনিটি মেডিসিন

কৃতি শিক্ষার্থী

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-১৯

প্রথম পেশাগত পরীক্ষা

মাহমুদা ছিদ্দিকা ইসরাত
৬ষ্ঠ ব্যাচ
বিষয়: এনাটমী

বেলাল মঈনুদ্দীন
৬ষ্ঠ ব্যাচ
বিষয়: এনাটমী

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৯-২০

প্রথম পেশাগত পরীক্ষা

সাদিয়া ইয়াসমিন
৭ম ব্যাচ
বিষয়: এনাটমী

শিক্ষাবর্ষ: ২০২০-২১

প্রথম পেশাগত পরীক্ষা

নাঈমুল ইসলাম ফাহিম
৮ম ব্যাচ
বিষয়: এনাটমী

জারিন তাসনীম রামিসা
৮ম ব্যাচ
বিষয়: এনাটমী

শিক্ষাবর্ষ: ২০২০-২১

দ্বিতীয় পেশাগত পরীক্ষা

জারিন তাসনীম রামিসা
৮ম ব্যাচ
বিষয়: কমিউনিটি মেডিসিন

শিক্ষাবর্ষ: ২০২০-২১

তৃতীয় পেশাগত পরীক্ষা

ওসামা নওরিন
৮ম ব্যাচ
বিষয়: ফার্মাকলোজি

জারিন তাসনীম রামিসা
৮ম ব্যাচ
বিষয়: ফার্মাকলোজি

শিক্ষাবর্ষঃ ২০২১-২২

প্রথম পেশাগত পরীক্ষা

জিবরান সামি খান
৯ম ব্যাচ
বিষয়: এনাটমী

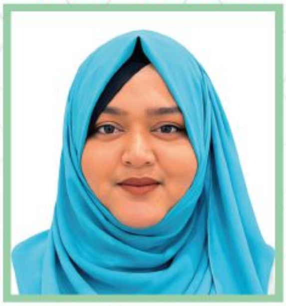

শাহিন আক্তার
৯ম ব্যাচ
বিষয়: এনাটমী

সারাহ ফারিহা নওশিন
৯ম ব্যাচ
বিষয়: এনাটমী

দ্বিতীয় পেশাগত পরীক্ষা

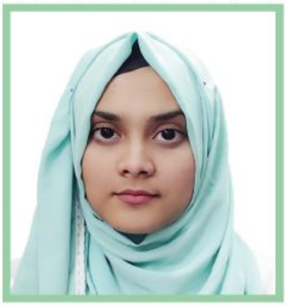

তাসমিয়া রহমান
৯ম ব্যাচ
বিষয়: ফরেনসিক মেডিসিন

তৃতীয় পেশাগত পরীক্ষা

সারাহ ফারিহা নওশিন
৯ম ব্যাচ
বিষয়: কমিউনিটি মেডিসিন এন্ড পাবলিক হেল্থ
মাইক্রোবায়োলজি

তাসমিয়া রহমান
৯ম ব্যাচ
বিষয়: কমিউনিটি মেডিসিন এন্ড পাবলিক হেল্থ

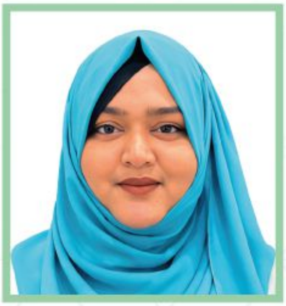

শাহিন আক্তার
৯ম ব্যাচ
বিষয়: কমিউনিটি মেডিসিন এন্ড পাবলিক হেল্থ

মানসী বড়ুয়া
৯ম ব্যাচ
বিষয়: কমিউনিটি মেডিসিন এন্ড পাবলিক হেল্থ

শিক্ষাবর্ষ: ২০২২-২৩

প্রথম পেশাগত পরীক্ষা

মিফতাহুল জান্নাত আরাবী
১০ম ব্যাচ
বিষয়: এনাটমী

তাসনীম হাসান তামিম
১০ম ব্যাচ
বিষয়: এনাটমী

মেহেরুন্নেছা তাসফি
১০ম ব্যাচ
বিষয়: এনাটমী

দ্বিতীয় পেশাগত পরীক্ষা

মিফতাহুল জান্নাত আরাবী
১০ম ব্যাচ
বিষয়: ফরেনসিক মেডিসিন

ফাবিহা করিম
১০ম ব্যাচ
বিষয়: ফরেনসিক মেডিসিন

তাসনীম হাসান তামিম
১০ম ব্যাচ
বিষয়: ফরেনসিক মেডিসিন

অতন্দ্রিলা ফেরদৌস ইলিন
১০ম ব্যাচ
বিষয়: ফরেনসিক মেডিসিন

মোছাম্মাৎ আকলিমা
১০ম ব্যাচ
বিষয়: ফরেনসিক মেডিসিন

মেহেরুন্নেছা তাসফি
১০ম ব্যাচ
বিষয়: ফরেনসিক মেডিসিন

শিক্ষাবর্ষ: ২০২৩-২৪

প্রথম পেশাগত পরীক্ষা

সাফওয়ান ইসলাম
১১তম ব্যাচ
বিষয়: এনাটমী

মুহাম্মদ আমিমুল ইহসান
১১তম ব্যাচ
বিষয়: এনাটমী

জুমাইনা চৌধুরী
১১তম ব্যাচ
বিষয়: এনাটমী

প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সফলতা (১ম ব্যাচ)

(সেশন: ২০১৩-১৪

ডা. মোঃ জহির উদ্দীন
এমফিল
(বায়োকেমিস্ট্রি)

ডা. আবু আকবর আলী
এফসিপিএস, পার্ট-১
এমআরসিপি, পার্ট-১
(মেডিসিন)

ডা. রিফাহ জারিন সুবাহ
এমডি ও এমআরসিইএম

ডা. শাহনেওয়াজ আরেফিন
এফসিপিএস, পার্ট-১
(ডার্মাটোলজি)

ডা. মাহাথির মাহমুদ
এফসিপিএস, পার্ট-১
(রেডিওলজি)

ডা. তাসনিম আলী চৌধুরী
এমআরসিপিএইচ, পার্ট-১
(ইউকে)

ডা. শাহাদাত
এমডি, পেলিয়াটিভ
(মেডিসিন)

ডা. ইমরান হোসাইন
এমআরসিপি ও এফসিপিএস, পার্ট-১
(সার্জারি)

ডা. উম্মে মরিয়ম
এফসিপিএস, পার্ট-১
(পেডিয়েট্রিক্স)

প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সফলতা (১ম ব্যাচ)

(সেশনঃ ২০১৩-১৪

ডা. রাকিবুল মোস্তফা
এফসিপিএস, পার্ট-১ (মেডিসিন)
এম.ডি (রেসিডেন্ট)
গ্যাসট্রোএন্ট্রোলজি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

ডা. সৈয়দ মোঃ মোনতাসির
এম.ডি (রেসিডেন্ট)
ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন
বারডেম

ডা. মুহাম্মদ ইয়াছিন চৌধুরী
এম.পি.এইচ
নিপসম

ডা. বেনজির হোসাইন প্রীতি
এম.আর.সি.পি, পার্ট-১
লন্ডন

ডা. মোঃ মিজানুর রহমান
এফসিপিএস, পার্ট-১
(অর্থোপেডিক্স সার্জারি)

প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সফলতা (২য় ব্যাচ)

(সেশনঃ ২০১৪-১৫

ডা. ইকবাল হোসেন
ডিএলও, ইএনটি

ডা. মঈন উদ্দিন
এফসিপিএস, পার্ট-১
(রিউমোটলজি)

ডা. মো. তাওহিদুল কবির হিমু
এফসিপিএস, পার্ট-১
(কেলোরেক্টোরাল সার্জারি)

ডা. আসিফ হোসেন জাহিন
এফসিপিএস, পার্ট-১
(নিওন্যাটলজি)

ডা. সাবরিনা রিয়া
এফসিপিএস, পার্ট-১
(গাইনী এন্ড অবস্)

ডা. দীপ্ত ভট্টাচার্য
এফসিপিএস, পার্ট-১
(মেডিসিন)

ডা. মুমতাহিনা মরিয়ম
এফসিপিএস, পার্ট-১
(মেডিসিন)

ডা. নার্গিস আক্তার
এফসিপিএস, পার্ট-১
(মেডিসিন)

ডা. ফাহিমা বিনতে ইউনুছ
এফসিপিএস, পার্ট-১
(পেডিয়েট্রিক্স)

প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সফলতা (২য় ব্যাচ)

সেশন: ২০১৪-১৫

ডা. নাফিছা সোলতানা
এফসিপিএস, পার্ট-১
(অবস্ এন্ড গাইনী)

ডা. মোঃ সাইফুল আলম চৌধুরী
এফসিপিএস, পার্ট-১
(মেডিকেল অনকোলজি)

ডা. ইসমত আরা তিথি
এফসিপিএস, পার্ট-১
(এন্ডোক্রাইনোলজি)

ডা. ডা. আবদুল মান্নান
এফসিপিএস, পার্ট-১
(ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহেবিলিটেশন)

প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সফলতা (৩য় ব্যাচ)

সেশন: ২০১৫-১৬

ডা. মুমতাহিনা রেজা স্বর্ণা
এফসিপিএস, পার্ট-১
(এন্ডোক্রাইনোলজি)

ডা. ফারজানা আকতার ইমা
এফসিপিএস, পার্ট-১
(মেডিসিন)

ডা. মো. আরমান হোসাইন
এমপিএইচ, নিপসম

ডা. সৈয়দ মো. সাকিফুর রহমান
এফসিপিএস, পার্ট-১
(অফথালমোলজি)

ডা. আবদুল মান্নান
এফসিপিএস, পার্ট-১
(অর্থোপেডিক সার্জারি)
ডিপ্লোমা ইন এনেস্থেশিয়া

ডা. আল শাহরিয়ার মোঃ রোকন
এফসিপিএস, পার্ট-১
(মেডিসিন)

ডা. তানজিলা আকতার
এফসিপিএস, পার্ট-১
(গাইনী এন্ড অবস্)

ডা. মঈন উদ্দীন হাসান শওকত
এফসিপিএস, পার্ট-১
(জেনারেল সার্জারি)

ডা. শাহিদা সিদ্দিকা
এফসিপিএস, পার্ট-১
(বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি)

প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সফলতা (৩য় ব্যাচ)

সেশন: ২০১৫-১৬

ডা. সাজিদুল কবির
এফসিপিএস, পার্ট-১
(গ্যাসট্রোএন্টোলজি)

ডা. মোহাম্মদ সাইফুল আলম
এম.ডি
(কার্ডিওলজি)

ডা. সালমা ইয়াছমিন উর্মি
এফসিপিএস, পার্ট-১
(এন্ডোক্রাইনোলজি এন্ড মেটাবলিজম)

ডা. নাশিদ নিয়াজ মুনিয়া
এম.আর.সি.পি, পার্ট-১ লন্ডন
(মেডিসিন)

প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সফলতা (৪র্থ ব্যাচ)

(সেশন: ২০১৬-১৭

ডা. সানজিদা হাসেম লিমন
এফসিপিএস, পার্ট-১
(পেডিয়াট্রিক্স)

ডা. শারমিন আক্তার
এম.ফিল
(প্যাথলজি)

ডা. ওবাইদুল ইসলাম মানিক
এফসিপিএস, পার্ট-১
(পেডিয়াট্রিক্স)

ডা. কুনসুমা আকতার
এমআসসিওজি
(গাইনি এন্ড অবস্)

ডা. আকিব বিন হানিফ
এফসিপিএস, পার্ট-১
(জেনারেল সার্জারি)

ডা. অজয় তালুকদার
এফসিপিএস, পার্ট-১
(কোলোরেক্টোরাল সার্জারি)

ডা. এলিজা ইয়াসমিন এ্যানি
এফসিপিএস, পার্ট-১
(জেনারেল সার্জারি)

ডা. রিফাহ তাসনিয়া আইরিন
এমআরজিওজি
(গাইনি এন্ড অবস্)

ডা. আনোয়ার হাসান সাকিব
এফসিপিএস, পার্ট-১
(কার্ডিওলজি)

ডা. আবুল কালাম
এমপিএইচ ইন হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট

ডা. শরীফা আনজুম
ডিপ্লোমা ইন ডার্মাটোলজি
এন্ড ভেনেরোলজি

ডা. নাফিসা আয়মান
ডিপ্লোমা ইন চাইল্ড হেল্থ

প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সফলতা (৫ম ব্যাচ)

সেশন: ২০১৭-১৮

ডা. সামির শিকদার
এফসিপিএস, পার্ট-১
এমআরসিপিইউকে
(কার্ডিওলজি)

ডা. এ এস এম জুনাইদ
এফসিপিএস, পার্ট-১
(ফিজিক্যাল মেডিসিন)

ডা. সামিরা
এফসিপিএস, পার্ট-১
(গাইনী)

ডা. সাজ্জাদ হোসাইন
এফসিপিএস, পার্ট-১
(ডার্মাটলজি)

ডা. মোহাম্মদ
এমপিএইচ
(হেলথ সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট এন্ড পলিসি)

(৬ষ্ঠ ব্যাচ)

সেশন: ২০১৮-১৯

ডা. মানাল তালুকদার
এফসিপিএস, পার্ট-১
(বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি)

ভর্তিকৃত ব্যাচসমূহ

এমবিবিএস ১১তম ব্যাচ (২০২৩-২৪)

এমবিবিএস ১২তম ব্যাচ (২০২৪-২৫)

স্মৃতির অ্যালবাম

স্মৃতির অ্যালবাম

সাবেক স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুরজাহান বেগমের আগমন উপলক্ষে ক্রেস্ট প্রদান। উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম-১৫ সংসদীয় আসনের এমপি আলহাজ্ব শাহজাহান চৌধুরী।

Institutional Symposium on Medical Education & Research প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক ধর্ম উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আ.ফ.ম খালেদ হোসেন

Institutional Symposium on Medical Education & Research প্রোগ্রামে Lifetime Achievement Award গ্রহণ করছেন অধ্যাপক ডা. এ কিউ এম মহসিন ও অধ্যাপক মোঃ আমির হোসেন অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

Breast Cancer Awarness প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।

MBBS ১২তম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম-২০২৫ ইং

স্মৃতির অ্যালবাম

কলেজ পরিদর্শনে আসেন চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. ওমর ফারুক ইউসুফ।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অস্বচ্ছল রোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সাবেক সচিব ড. মো: মহিউদ্দিন।

কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শনে আসলে গ্যাস্ট্রোএন্ট্রোলজি সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক ডা. এ কিউ এম মহসিনকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান সোসাইটির সম্মানিত চেয়ারম্যান ডা. এ.কে.এম ফজলুল হক।

কলেজের নিয়মিত গভর্নিং বডির সভা অনুষ্ঠিত।

চক্ষু চিকিৎসা সেবা পক্ষ উদ্বোধন করছেন সোসাইটির সম্মানিত চেয়ারম্যান ডা. এ.কে.এম ফজলুল হক।

কলেজের নিয়মিত একাডেমিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত।

স্মৃতির অ্যালবাম

এমবিবিএস ১১তম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তব্য রাখছেন সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি অধ্যাপক মোঃ নুরুন্নবী

কারিকুলাম পরিচিতি প্রোগ্রাম, এমবিবিএস চতুর্থ ফেইজ।

এমবিবিএস ১০ম ব্যাচের (৪র্থ বর্ষ) ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম।

এমবিবিএস ১১তম ব্যাচের (৩য় বর্ষ) ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম।

এমবিবিএস ৯ম ব্যাচের (৫ম বর্ষ) ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম।

স্মৃতির অ্যালবাম

২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ।

২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা।

২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ।

১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ।

বিশ্ব এইডস দিবস পালিত।

ইন্টার্নাল মেডিসিন দিবস পালিত।

স্মৃতির অ্যালবাম

বিশ্ব স্ট্রোক দিবস।

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে র‍্যালি।

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে র‍্যালি।

বিশ্ব এন্টিমাইক্রোবিয়াল সচেতনতা সপ্তাহ উপলক্ষে আলোচনা সভা।

বিশ্ব উচ্চ রক্তচাপ দিবস উপলক্ষে আলোচনা।

স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় সভা।

স্মৃতির অ্যালবাম

সৌদি আরবের সম্মানিত অতিথিকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করছেন আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের চেয়ারম্যান ও সাবেক সংসদ সদস্য মাওলানা আ ন ম শামসুল ইসলাম।

International Islamic University Malaysia এর সাথে MoU স্বাক্ষরিত।

স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে বক্তব্য রাখছেন ব্যারিস্টার সাজিদ মিয়া।

ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপ প্রোগ্রাম।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে পোস্টার প্রদর্শনী।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা।

স্মৃতির অ্যালবাম

কলেজ ম্যাগাজিন 'প্রত্যাশা'-এর মোড়ক উন্মোচন প্রোগ্রাম।

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসে অতিথিকে ক্রেস্ট প্রদান।

বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবসে অতিথিকে ক্রেস্ট প্রদান।

এমবিবিএস ৭ম ব্যাচের ইন্টার্ন ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম।

ইন্টার্নদের নিয়ে জেনেরিক স্কিল ওয়ার্কশপ।

Cervical Cancer Awarness Month উপলক্ষে আলোচনা সভা।

জরায়ুমুখ ক্যান্সার সচেতনতা প্রোগ্রাম।

Workshop on Medical Ethics in Clinical Practice.

Unveiling Ceremony of Hospital Infection Prevention & Control Manual.

Workshop on Basic Surgical Skill.

স্মৃতির অ্যালবাম

Orientation on Accreditation of Medical College.

Pair Medical College Visit Chattogram Maa-O-Shishu Hospital Medical College.

Pair Medical College Visit Army Medical College.

Training on Teaching Methodology & Assessment.

Workshop on SOE, OSPE & OSCE.

I/V Cannulation Training Program

স্মৃতির অ্যালবাম

পদোন্নতি প্রাপ্ত শিক্ষকদের সংবর্ধনা।

সিআইএমসি ডে উদযাপন।

Basic Life Support Training Programme.

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস পালন।

এমবিবিএস ৭ম ব্যাচের ইন্টার্ন সমাপনী প্রোগ্রাম।

মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে সীরাত কনফারেন্স।

স্মৃতির অ্যালবাম

3rd International Conference
&
(4th International Conference)
Institutional Symposium on Medical Education & Research

স্মৃতির অ্যালবাম

বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ

স্মৃতির অ্যালবাম

বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ

স্মৃতির অ্যালবাম

সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা

বিতর্ক প্রতিযোগিতা

বিপক্ষ দল
মডারেটর

পুরস্কার বিতরণ

PR = PowerRuffle
নির্বাচন = Seat
বাণিজ্য
বিতর্ক প্রতিযোগিতা
(ফাইনাল রাউন্ড) ও
আলোচনা সভা
বিপক্ষ দল

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

৫০০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল

হাসপাতালের বিভাগসমূহ

- মেডিসিন
- নিউরোমেডিসিন
- সার্জারী
- ইউরোলজী
- অব্‌স এন্ড গাইনী
- নাক-কান ও গলা
- শিশু মেডিসিন
- শিশু সার্জারী
- চক্ষু বিভাগ
- কার্ডিওলজি
- চর্ম ও যৌন রোগ
- ফিজিক্যাল মেডিসিন
- ফিজিওথেরাপি সেন্টার
- রক্ত ও রক্তরোগ
- মনোরোগ বিভাগ
- অর্থোপেডিক
- ডায়াবেটিস ও হরমোন ক্লিনিক
- ভ্যাকসিন সেন্টার
- অর্থোপেডি ল্যাপারোস্কপিক মেশিনসহ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ ও.টি কমপ্লেক্স

অপারেশন সমূহ

- সিজার অপারেশন
- হারনিয়া অপারেশন
- এ্যাপেন্ডিকস অপারেশন
- জরায়ু অপারেশন
- ডি এন্ড সি অপারেশন
- পিত্তথলী অপারেশন
- হাইড্রোসিল অপারেশন
- এস.এম.আর অপারেশন
- টনসিল অপারেশন
- পাইলস্‌ অপারেশন
- এ্যানাল ফিস্টুলা অপারেশন
- এ্যানাল ফিশার অপারেশন
- এন্ডোসকপিক ও ল্যাপারোসকপিক সার্জারী
- অর্থোপেডিক সার্জারী
- মুখ ও চোয়ালের অপারেশন এবং
- স্বল্পমূল্যে সকল ধরনের অপারেশন

ডায়াগনষ্টিক সার্ভিসসমূহ

- অটোমেটেড বায়োকেমিষ্ট্রি এনালাইজার এর মাধ্যমে সব ধরনের প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা
- ৫০০ এম এ ডিজিটাল মেশিনে এক্স-রে
- এন্ডোস্কপি ও কোলনস্কপি
- আল্ট্রাসনোগ্রাম (কালার ডপলার)
- ই.সি.জি
- অত্যাধুনিক ইকোকার্ডিওগ্রাফি মেশিন
- সিটি স্ক্যান
- আধুনিক ফিজিওথেরাপী সেন্টার (সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা)
- ব্লাড ব্যাংক

চট্টগ্রামের যে কোন বেসরকারী হাসপাতালের তুলনায় কম খরচে সকল চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়

সার্বক্ষণিক PICU, NICU, HDU ও CCU সার্ভিস চালু আছে

ব্যথামুক্ত নরমাল ডেলিভারী করা হয়।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগীদের নিয়মিত চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়।

২৪ ঘন্টা জরুরী বিভাগের সার্ভিসসহ এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস দেয়া হয়

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল ডেন্টাল কলেজ হাসপাতাল

৬৫ ইউনিট চেয়ার সমৃদ্ধ চট্টগ্রামের সর্ববৃহৎ বেসরকারি ডেন্টাল হাসপাতাল

আমাদের সেবাসমূহ

- পরামর্শ প্রদান
- স্কেলিং ও পলিশিং
- যাবতীয় ফিলিং (সিলভার এমালগাম, কসমেটিক ফিলিং ইত্যাদি)
- রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট (আরসিটি)
- ক্রাউন/ক্যাপ
- ডেন্টাল ব্রীজ
- ইমপ্ল্যান্ট ও লেজার ডেন্টিস্ট্রি (ফাঁকা স্থানে স্থায়ী কৃত্রিম দাঁত বসানোর বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত পদ্ধতি)
- দাঁত তোলা (নরমাল ও সার্জিক্যাল)
- কৃত্রিম দাঁত লাগানো
- দাঁত ও মুখের যাবতীয় অপারেশন (লোকাল/জেনারেল এনেসথেসিয়া দিয়ে)
- আঁকা-বাঁকা ও ফাঁকা দাঁতের বিশেষায়িত চিকিৎসা (অর্থোডন্টিক ট্রিটমেন্ট)
- শিশুদের দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা (দাঁত তোলা, ফিলিং, পালপেকটমি, পালপোটমি ইত্যাদি)
- দাঁতের ডিজিটাল এক্স-রে (আরভিজি)
- এক্স-রে ওপিজি
- সিবিজি

অন্যান্য বেসরকারী হাসপাতালের তুলনায় সকল চিকিৎসা খরচে ২৫% কম

দাঁত ও মুখ-গহ্বরের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রতি ৬ মাস অন্তর ডেন্টাল সার্জনের পরামর্শ নিন

৩২৩/৪৩৪, হাজী চান্দমিয়া রোড, শমসের পাড়া, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।
E-mail: info.cimchbd@gmail.com, Website: www.cimch.edu.bd